Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ

Children's Music in Education: A Field Study

দেবশ্রী দোলন

এম.ফিল. গবেষক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ

Children's Music in Education: A Field Study

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবশ্রী দোলন

এম.ফিল. (২য় পর্ব)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৭

রেজিঃ নং- ১৮০

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগীত বিভাগ

ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়

জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ' (Children's Music in Education : A Field Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের রচনা। এটি আমার এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পাদিত গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশবিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করা হয়নি এবং কোন জার্নাল, সাময়িকী, পুস্তক কিংবা কোন প্রকাশনার আকারেও এই গবেষণা বা এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়নি।

দেবশ্রী দোলন
এম. ফিল. (২য় পর্ব)
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৭
রেজিঃ নং-১৮০
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, দেবশ্রী দোলন, রেজিঃ নং-১৮০, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭ কর্তৃক উপস্থাপিত 'শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ' (Children's Music in Education : A Field Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি। আমার নিকট সম্পূর্ণ মৌলিক মনে হওয়ায় অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(স্বাক্ষর)
ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ' (Children's Education in Music : A Field Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরে পরম করুণাময়ের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণাটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী'র তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ ও সহযোগিতাপূর্ণ শিক্ষকের নির্দেশনায় গবেষণাটি সম্পাদন করতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উৎসাহ, সঠিক দিক নির্দেশনা ও সহযেগিতার প্রসূত ফল হলো এই অভিসন্দর্ভ। আমি তাঁর প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ব্যবহারগত বিষয়গুলো নিয়ে আমার মধ্যে আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারি অধ্যাপক আজিজুর রহমান তুহিন। শিশুদের উপযোগী গান ও তার শিক্ষণ, সঠিক ব্যবহার, প্রচলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাকে নির্দেশনা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তাঁর আন্তরিকতা এই গবেষণাকর্মের অন্যতম অনুপ্রেরণা হিসেবে যোগান দিয়েছে।

এই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং সুচিন্তিত মতামত যুক্ত করতে পেরেছি তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সময়ে অসময়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছে আমার অনুজ ইয়াতসিংহ শুভ (প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়)। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগের বড় ভাই আবু সাইদকে। যিনি গবেষণার বিভিন্ন ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে থাকা সকল বন্ধুদের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো।

হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধার্ঘ্য ভরে স্মরণ করছি আমার বাবা-মা কে। যাঁরা আমার সাফল্যে গৌরবান্বিত হন। সেই সাথে আমার শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই চন্দন হালদারকে। যিনি আমার উচ্চতর পড়াশুনার অন্যতম পাথেয় হিসেবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই তাঁকে, যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার প্রতি আমার অবিচল আস্থা, যাঁর গুরুত্ব আমার সব কিছুতেই অপরিসীম, আমার জীবন চলার সাথী দেবাশীষ ভৌমিককে। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কার্য সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

দেবশ্রী দোলন

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

সংগীত হলো মানুষের মনের বস্তুনিষ্ঠ সুরেলা ভাবের প্রকাশ। আর যে কোন সুর হলো সংগীতের প্রাণ। প্রাচীনকালে সংগীতের এই সৌকর্যকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারার উদ্ভাবন হয়েছে। সেই চর্যাপদ বা চর্যাগীতি থেকে শুরু করে বর্তমানের ব্যান্ডসংগীত বা আরও লঘু প্রকৃতির গান সমান জনপ্রিয়তায় প্রবাহিত হচ্ছে। তবে পার্থক্য এটুকুই লক্ষ্য করা যায় যে, সেসময় শাস্ত্রীয় সংগীতের খুব বেশি কদর ছিল। আর তাও ছিল নির্দিষ্ট সমাজপতিদের অন্তর্তুষ্টির জন্য। সাধারণ মানুষ সেই সংগীতধারাকে ততটা গুরুত্বের সাথে বুঝে উঠতে পারতেন না। তাই যখন ক্রমেই এই সংগীতধারার বিবর্তন ঘটলো তখন সকল শ্রেণীর মানুষ এই সহজধারার সংগীতকে অনুধাবন করতে লাগলেন। নানা দেবদেবীর লীলা বর্ণিত সুরেলা মুখভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ পেল গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, পাঁচালি, মঙ্গলগান প্রভৃতি সংগীতধারায়। পরবর্তী সময়ে খানিক প্রশ্নোত্তর পর্ব বা দুপক্ষের সুরেলা দ্বন্দ নিয়ে কবিগানের প্রচলন শুরু হয়। আর তার পরেই আসে যাত্রাগান। যা ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে মিশে একাকার হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় নানা ধরণের লঘু সংগীতের জোয়ারে ঠাঁই পেল শিশুদের উপযোগী গান, অর্থাৎ শিশুতোষ সংগীত । শিশুমন যেহেতু কোমল তাই যে কোন গান তার মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার উর্ধ্বে হবে এটাই স্বাভাবিক। এই শিশুরা যাতে তাদের নির্মল আনন্দ খুঁজে নিতে পারে তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন রচয়িতারা শিশুদের উপযোগী গান ও কবিতা লেখা শুরু করেন। যদিও পরবর্তীকালে অনেক কবিতাই সুর করে গানে রুপান্তর করা হয়। এসকল গানের রচয়িতা বা সুরকারের বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন বয়সের লেখকই এই ধরণের গান লিখতে বা সুর করতে পারেন।

শিশুদের মানসিক বিকাশ তার জীবনে জন্ম থেকে কমপক্ষে দশ বছর পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর জীবনের বেশিরভাগ জ্ঞান এ সময়েই বিস্তৃতি পায়। তাই জন্মের কিছুকাল পর থেকেই যদি শিশুকে বিভিন্ন সুরে আবিষ্ট রাখা যায় তাহলে ধীরে ধীরে শিশুর মস্তিষ্কের উন্নয়ন ঘটে। এছাড়া শিশুর বেড়ে ওঠার পাশাপাশি যদি বিভিন্ন উপকরণসমৃদ্ধ গান এবং সামাজিকতা, স্বদেশচেতনা, পারিবারিক চেতনা, নৈতিকতামূলক তদুপরি বিভিন্ন শিক্ষামূলক গান শেখানো হয় তাহলে শিশুর মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

শিশুর জীবনে এ ধরণের সুর ও সংগীতের আবহ জন্মের পর থেকেই চলমান থাকে। তবে তারা এর মাধ্যমে যথেষ্ট আনন্দ পায় কি না তা বোঝা যায় না। শিশুরা যদি এসকল সাংগীতিক কর্মকাণ্ড সংঘবদ্ধভাবে করতে পারে তাহলে তারা খুব দ্রুত যে কোন জিনিস আয়ত্বে আনতে পারে এবং নিজেদের জীবনেও প্রয়োগ করতে পারে। আর এই সংঘবদ্ধ অনুশীলন শিশুকে যেকোন বিদ্যালয় বা শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্পর্শে আনলেই শুধুমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব। কেননা শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকরণপ্রিয়। শিশুরা স্বভাবগতভাবে অনুকরণ করে যে কোন জিনিস খুব সহজে আয়ত্বে আনতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলনের ফলে শিশুরা আনন্দ পায়, তাই শিক্ষকেরও উচিৎ শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে শিশুকে মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন করে তৈরি করা। শিক্ষকদের আদর স্নেহ মাখা সাংগীতিক আচরণ শিশুর মানসিক বিকাশে অন্যতম ভূমিকা রাখে।

শিক্ষাঙ্গনের এসকল শিশুভিত্তিক কার্যক্রম যে শুধুমাত্র আমাদের দেশেই চলমান এমন নয়। আন্তর্জাতিক বিশ্বে সংগীতের সাথে শিশুর সম্পৃক্ততা জন্মের পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। তাই সেসকল দেশে শিশুদের মানসিক উন্নয়ন খুব দ্রুত বর্ধিত হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে সংগীত বলতে শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীতকেই বোঝায় না, যন্ত্রসংগীতকেও বোঝায়। কণ্ঠসংগীত শেখানোর পাশাপাশি যন্ত্রসংগীত শেখার ফলে শিশুদের নানা কাজে উদ্ভাবনী চিন্তাধারারও পরিচয় মেলে। এর মাধ্যমে শিশুরা সংগীতের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে শিখতে পারে। তাল, লয়, ছন্দ, সুর প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায়, সকল দেশেই যে একই ধারাবাহিকতায় শিশুদের সংগীতচর্চা হয় এমনটা নয়। তুলনামূলক উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সংগীত শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সংগীত শিক্ষার তেমন কোন প্রসার লক্ষ্য করা যায় না। আবার সে তুলনায় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের সংগীত শিক্ষণে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে এবং কোন না কোনভাবে শিশুদের সংগীত তথা শিল্পচর্চার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস করেই চলেছে। এ সবকিছু শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষক তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্যক চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই শুধুমাত্র সম্ভব। তাই শিক্ষাঙ্গনে জাতির মেরুদণ্ডের শক্ত কাঠামো তৈরিতে ভিত্তি হিসেবে শিশুদের মেধাবিকাশে সংগীতের সাহচর্য অনুপ্রেরণা তৈরির এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমার ধারণা। এসকল তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতেই শিক্ষাঙ্গনের শিশুতোষ সংগীতের বর্তমান রূপটি তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে এ গবেষণাকর্মে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ঘোষণাপত্র ---------- ii

প্রত্যয়নপত্র ---------- iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ---------- iv

সারসংক্ষেপ---------- vi

সূচিপত্র ---------- vii

ভূমিকা ---------- **১**

অধ্যায় বিভাজন ---------- **৩**

প্রথম অধ্যায়: সংগীতের সংজ্ঞা ও বাংলা গানের ধারা---------- ৫

১.১ সংগীতের সংজ্ঞা---------- ৬

১.২ বাংলা সংগীতের ধারা---------- ৭

১.২.১ চর্যাগীতি---------- ১০

১.২.২ নাথগীতি---------- ১১

১.২.৩ গীতগোবিন্দ---------- ১২

১.২.৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন---------- ১৩

১.২.৫ কীর্তন---------- ১৫

১.৩ মধ্যযুগীয় বাংলা গান---------- ১৫

১.৩.১ মঙ্গলকাব্য---------- ১৫

১.৩.২ শাক্ত পদাবলি---------- ১৬

১.৩.৩ টপ্পাগান---------- ১৬

১.৩.৪ কবিগান ---------- ১৭

১.৩.৫ আখড়াইও হাফ আখড়াই---------- ১৮

১.৩.৬ যাত্রাগান ---------- ১৮

১.৪ আধুনিক যুগের গান---------- ১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: শিশুতোষ সংগীত----------২২

২.১ শিশুতোষ সংগীতের সংজ্ঞা---------- ২৩

২.১.১ শিশুদের মানসিক বিকাশে সংগীত---------- ২৫

২.২ শিশুতোষ সংগীত রচয়িতা---------- ২৭

২.৩ শিশুতোষ সংগীতে পঞ্চকবির অবদান---------- ২৯

২.৪ শিশুতোষ সংগীতের কথা ও সুর---------- ৩৩

২.৫ প্রচলিত শিশুতোষ সংগীত---------- ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত---------- ৪৩

৩.১ শিশুতোষ সংগীত ও শিক্ষা---------- ৪৪

৩.২ শিক্ষায় শিশুতোষ সংগীতের গুরুত্ব---------- ৪৬

৩.৩ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিক বিকাশে শিশুতোষ জ্ঞান ও পারস্পরিক সম্পর্ক ---------- ৪৭

৩.৪ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুতোষ সংগীত---------- ৫১

৩.৪.১ ছড়াগান---------- ৫২

৩.৪.২ উদ্দীপক গান---------- ৫৩

৩.৪.৩ শহিদ দিবসের গান---------- ৫৪

৩.৪.৪ জাতীয় সংগীত---------- ৫৫

৩.৫ আন্তর্জতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুতোষ সংগীত---------- ৫৭

৩.৬ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত শিশুতোষ

সংগীতধারার তুলনামূলক আলোচনা---------- ৬১

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের শিশুতোষ সংগীতকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুধীজনের সাক্ষাৎকার---------- ৬৩

৪.১ বাংলাদেশে শিশুতোষ সংগীতকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান---------- ৬৪

৪.১.১ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি---------- ৬৫

৪.১.২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি---------- ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩ নজরুল ইনস্টিটিউট ---------- ৬৮

৪.১.৪ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন---------- ৭০

৪.১.৫ ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন---------- ৭১

৪.১.৬ সুরের ধারা---------- ৭২

৪.১.৭ বাফা (বুলবুল ললিতকলা একাডেমি)---------- ৭৩

৪.১.৮ সুরবিহার---------- ৭৪

৪.২ সুধীজনের সাক্ষাৎকার---------- ৭৫

৪.২.১ মনস্তাত্ত্বিকদের সাক্ষাৎকার---------- ৭৬

৪.২.২ শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার ---------- ৮৫

৪.২.৩ অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার ---------- ৯২

৪.৩ গবেষকের পর্যবেক্ষণ ও মতামত ---------- ৯৯

উপসংহার---------- ১০১

গ্রন্থপঞ্জি ও চিত্রসূচি ---------- ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানব জীবন মূলত শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। ভূমিষ্ঠ হবার পর দৈহিক অবয়ব নিয়ে সে ঘোষণা করে তার জাগতিক উপস্থিতি। তাই বলা যায়, মানব অস্তিত্বও পুরোপুরি শিশুকেন্দ্রিক। আর এই মানব অস্তিত্বের মহত্ত্ব জন্মক্ষণ থেকেই শুরু হয়। একটি শিশু জন্মের পরপরই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর সহজাত আত্মিক ক্ষমতারাজির উন্মোচনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তবে শিক্ষার যে গোঁড়ামিপূর্ণ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র কথাসর্বস্ব, তা এই বয়সের জন্য উপযুক্ত নয়। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে একান্ত স্বকীয় কিছু আত্মিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা তার শিক্ষককে শিক্ষাধারার নতুন এক পথের সন্ধান দেয়। এই শিক্ষক কোন পেশাদার ব্যক্তি নয়। পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাই শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষক। শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে শিশুদের বিভিন্ন সুরের সাথে পরিচয় করানো যেতে পারে। হোক না সে সুর অর্থপূর্ণ বা অর্থহীন, শব্দযুক্ত বা শব্দহীন! মনুষ্যত্বের উন্মোচনে শিশুমনের সুকুমার প্রবৃত্তিকে প্রখর করতে এই সুর বা সংগীতের কোন বিকল্প নেই। কারণ ললিতকলার সকল অঙ্গের মধ্যে সংগীত হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা মানবতন্ত্রীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পারে এবং যা অন্য কোন প্রকাশলীলায় সম্ভব নয়। শৈশবকাল থেকেই যদি শিশুমনকে গানের ভিতর দিয়ে পঠন পাঠনের উপযোগী করা হয় তা হলে সে সংস্কৃতিমনা মানবিক গুণাবলি নিয়ে বিকশিত হতে পারে।

শিশুর জীবনের প্রথম দু'বছর পরিবারের সকলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। কারণ এ সময়েই শিশুর আত্মিক বিনির্মাণের বিধানগুলি লক্ষ্য করা যায়। শিশুর মানসিক ও ভাষার উন্নয়নের এই ব্যাপারটি অনুধাবনপূর্বক গবেষণা করা যায় যে, শব্দের বা সুরের প্রথম উপাদানগুলির ব্যবহার শিশুর জীবনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে যায়। কারণ শিশুমন স্বভাবতই কোমল ও সুর পিয়াসি। সুর বা সংগীত শিশুমনকে আকর্ষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলির বিকাশ ও জীবনকে মাধুর্য্যমন্ডিত করে তোলার জন্য অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সুকুমার শিল্পচর্চারও সুযোগ সৃষ্টি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা যোগানোর জন্য বিশেষ আত্মিক শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। যা তিন বছর বয়স থেকেই শিশুর ভবিষ্যৎ মানুষটির ব্যাক্তিত্বের ভিত্তি তৈরি করে ফেলে। আর তার পরেই প্রয়োজন হয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রভাবের। এই প্রেক্ষিতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি সংগীত বিষয়টিকে একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতের সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর চিত্তে সুকুমার শিল্প মানসিকতা গড়ে ওঠে। নির্মল আনন্দ দানের সাথে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার অপার সম্ভাবনাময় দিকটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে সংগীতকে একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়েছে ।

বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে শিশুদের প্রতি শিক্ষার যে গুরুত্ব তার উপর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই জোর দেয়া হচ্ছে। সেসব দেশেও সংগীত একটি অনিবার্য বিষয়। সংগীতকে শিক্ষার সাথে আরো জোড়ালোভাবে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ড. নিনা ক্রাউস তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যার অনুবাদ হলো, "সংগীত শিক্ষায় শিশুদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হতেও সাহায্য করে"। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, গান গাইতে শিখেছে বা সংগীতের সাথে সম্পৃক্ত এমন শিশুরা লেখাপড়ায় ও অন্যান্য প্রতিভাশীল কাজে বেশ মেধাবী হয়ে গড়ে ওঠে । অনেকে আবার কণ্ঠসংগীতে পারদর্শী না হলেও বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী হয়ে শব্দ এবং ভাষা শিক্ষায়ও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে ।

পৃথিবীতে যে মানুষের আত্মার সঙ্গে সংগীতের বাস সেই মানুষই ভালবাসতে জানে। এই জীর্ণ পৃথিবীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই প্রতিষ্ঠানিক সংগীত চর্চার কোন বিকল্প নেই। সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। সংগীতের শিক্ষা এমন নয় যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর কোন গুরুর প্রয়োজন নেই। যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুর সাহচর্যে এসেও সংগীতে জ্ঞানার্জন করা যায় তাহলে সেই শিক্ষার প্রয়োগ আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী হবে বলে আশা করা যায়। শিশুদের জীবনে সংগীতের এই প্রভাব জীবনকে আরো সাবলীল করবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সংগীতের ব্যাপক প্রচার কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠনিকভাবেই সম্ভব। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় হতে পারে একটি উপযোগী যোগসূত্র। সংগীতকে সাধারণের মাঝে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে প্রচারের যোগ্য করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং সংগীতের ব্যপক প্রসারের বিষয়টি আজ অতি প্রয়োজনীয় এবং এই বিষয়টি প্রতিস্থাপন করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিভাজন

শিশুদের জীবনে সংগীতের এই প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণপূর্বক গবেষণাটিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। আর এসব অধ্যায়ে সংগীতের প্রাথমিক পরিচয় থেকে শুরু করে শিশুতোষ সংগীতের বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ অধ্যায় বিন্যাসের প্রথমেই রয়েছে সংগীত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, সংগীতের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কে বিশ্লেষণ। এই অধ্যায়টিতে সংগীতের উৎপত্তি এবং প্রাচীন মুনিঋষিসহ অভিজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। পরক্ষণেই বাংলা সংগীতের বিকাশ ও ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কালের বিবর্তনে সংগীতের যেসকল ধারা যেমনঃ চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, কবিগান প্রভৃতি ক্রমবিবর্ধমান ছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে প্রাচীন থেকে আধুনিক সাংগীতিক ধারাবাহিকতা ও তার সঠিক প্রচলন সম্পর্কে অবগত করার প্রয়াস এই গষেণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সংগীত সৃষ্টির পরপরই এর বিভিন্ন ধারার আবর্তন শুরু হয়। দর্শকপ্রিয়তার দিক থেকে এই বিভিন্ন ধারার সূত্রপাত। কান ও মনের প্রশান্তির জন্য শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের লঘু সংগীতেরও চাহিদা প্রবর্তিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগের গানের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে শিশুতোষ সংগীতের প্রচলন শুরু হয়। সকল বয়সের মানুষের সংগীতপ্রীতির খোরাক হিসেবে বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত গান রয়েছে। শিশুদের মানসিক উন্নয়নে শিশুতোষ সংগীত কি ধরণের ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। তাছাড়া শিশুতোষ সংগীতগুলোর রচয়িতা ও শিশুতোষ সংগীত রচনায় বাংলা গানের প্রেক্ষাপটে পঞ্চকবির অবদান, তাঁদের গানের কথা ও সুর প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত কিছু শিশুতোষ সংগীতও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শিশুতোষ সংগীতের বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এই গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুতোষ সংগীতের বিভিন্ন ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে। যদিও শিশুমনের উপযুক্ত গানগুলো যেকোন সময়ে যেকোন বয়স থেকেই শুরু করা যায়। তথাপিও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা অঙ্গন শিশুদের শিক্ষার্থী মানসিকতাকে প্রশমিত করে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষা শিশুদের মানসিক বিকাশের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় বা সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র মাধ্যম যেখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতকে সমমানে মূল্যায়িত করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীতকে বাধ্যতামূলক করেছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নির্দেশিকা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত সংগীত বিষয়ক বই বিতরণ করেন। ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীতকে আলাদা বিভাগ হিসেবে বিবেচনাপূর্বক প্রচলন করে এর ধারাবাহিকতাকে বর্ধিত করা হয়েছে। শিশুদের মেধাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে উপরে উল্লিখিত শিক্ষক নির্দেশিকায় শিশুদের উপলব্ধিজাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই গান শিশুদের মনে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন ছড়াগানে তাদের মনোযোগী করে সামাজিক ও পারিবারিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বেও শিশুদের সংগীত ও সাংগীতিক পর্যায়সমূহকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এসব দেশে শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য খুব ছোট বয়স থেকেই সংগীতের সাহচর্যে নিয়ে আসা হয়। আর তাতে যে মানসিক স্ফুরণ ঘটে তারই প্রতিফলন তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়াও বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে শিশুদের উপযোগী সংগীতের তুলনামূলক কিছু বিশ্লেষণ করে একটি যুগোপযোগী ধারণা দেয়ারও প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়ে কাজ করেন, শিশুদের মানসিকতা বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীত বিষয়টিকে যারা আনন্দের সাথে পাঠদান করেন এমন ব্যক্তিদের মূল্যবান মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়। উল্লেখ্য, বিদ্যালয় ছাড়াও দেশের বিভিন্ন সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী সংগীতের গুরুত্ব, শিক্ষণ কার্যক্রম ও শিশুদের মানসিক বিকাশের দিক নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুর মানসিকতা বিকাশ, শিক্ষার বিষয় হিসেবে সংগীত বা সন্তানের জীবনে বেড়ে ওঠার সাথে সংগীত কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারই ব্যক্তিগত মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়টিতে। এমন বিশিষ্টজনদের মূল্যবান মতামত সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক বিবরণও এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহারঃ পরিশেষে উপসংহারে উল্লিখিত সকল অধ্যায়ের একটি সার্বিক বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা এবং জাতি গঠণে সংগীতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংগীতের অদূর ভবিষ্যত, প্রয়োগ, প্রচলন, ব্যবহার এমনকি প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণেরও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে শিশুতোষ সংগীতের উপযুক্ত ব্যবহারের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সংগীতের সংজ্ঞা ও বাংলা সংগীতের ধারা

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা যেমন মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, সংগীত ও তেমনি মানুষের হৃদয়ের সুরেলা ভাব প্রকাশের মাধ্যম। বলা যায়, সংগীত হলো ভাবের পরিশীলিত রূপ। আর এই রূপটি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সুর। যে সুর মানুষের মনে ভাবের উদ্রেক ঘটায়, নিত্য কথোপকথন ও অনুভূতি প্রকাশ করে অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটায় তাকেই সংগীত বলে। মূলত গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সম্মিলিত উপস্থাপনকেই সংগীত বলা যায়। তবে গীত ও বাদ্যের সমন্বয় করে বর্তমানে সংগীত উপস্থাপিত হলেও কাঠামোগত দিক থেকে নৃত্যকে আলাদাভাবে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলা হয়েছে। বাংলা সংগীতের এই ধারায় কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সংগীত কাঠামো এসেছে যার স্রোতে বাংলা লঘু সংগীতের আগমণ। বাংলা লঘু সংগীতের এই ধারায় আবার শিশুদের উপযোগী সংগীত রয়েছে। যা শিশুর মানসিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকাপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও এই ধারার সকল গান প্রথম অবস্থায় ছড়াকারে এবং পরবর্তী সময়ে সুর দিয়ে শিশুদের উপভোগ্য করে তোলা হয়। এসকল গান শুধুমাত্র মস্তিষ্ক বিকাশেই নয়, সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ উন্মোচনেও জীবনের প্রথম থেকেই ভূমিকা পালন করে।

১.১ সংগীতের সংজ্ঞা

প্রাচীনকালে সংগীত বলতে গীত, বাদ্য বা নৃত্যের সমাহারকে বোঝাতো। কিন্তু সংগীত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে গান। "গৈ" ধাতু থেকে সংগীত কথাটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। কারণ "গৈ" শব্দের অর্থই গান করা। কিন্তু বর্তমানে সংগীত বলতে কেবল কণ্ঠসংগীতকেই বোঝানো হয়। আর যন্ত্রবাদনকে যন্ত্রসংগীত বলা হয়। তবে অনেক জায়গায় নৃত্যকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী সংগীত শব্দের অর্থ গান করা। এদিকে বিশ্লেষণগত দিক থেকেও দেখা যায় 'সং' শব্দের অর্থ উত্তমরূপে আর 'গীত' শব্দের অর্থ গান করা। অর্থাৎ উত্তমরূপে গান গাওয়াকেই সংগীত বলে। এ বিষয়ে "সংগীত পারিজাত" গ্রন্থে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উক্তি এইরূপঃ

"নাহং বসামী বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে চ
মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ"[১]

অতএব, সংগীত শুধুমাত্র গান নয়, হৃদয়ের একানিষ্ঠ সুরের মাধ্যমে ভক্তিপ্রকাশ, সংগীত হচ্ছে সাধনা ও আধারপার বিষয়বস্তু। সুরের মাধুর্য্যের সাথে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদনের একটি পন্থা হল সংগীত। এ সম্পর্কে পন্ডিত অহোবল "সংগীত পারিজাত" গ্রন্থে বলেছেন-

"গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে
গানস্যহত্র প্রদানত্বাৎ তৎ সংগীতমিতীরিকম ॥

[১] পন্ডিত অহোবল, সংগীত পারিজাত, প্রকাশক- দীপায়ন, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সম্মিলিত পরিবেশনকেই সংগীত বলা হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে মূখ্য হচ্ছে কণ্ঠসংগীত। তাই সংগীত বলতে বেশীরভাগ মানুষই কণ্ঠসংগীতকেই বোঝেন।"[২]

এছাড়াও কণ্ঠ বা যন্ত্রবাদনের সঙ্গে আনদ্ধ যন্ত্রের নির্দেশমূলক সংগতকেও সংগীত বলা হয়। আনদ্ধ বলতে তবলা, পাখোয়াজ, ঢোল, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়। এসব বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতের অনুগামী হয়। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতের অপরিহার্য অংশ।

সংগীতের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত উপমহাদেশে প্রচলিত হয়েছে। কথা ও সুরের মধ্যে প্রবীণতম এই ধারা নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি। তবে বেশীরভাগ সংগীতজ্ঞের মতে ভাষা সৃষ্টির আগে সংগীতের সৃষ্টি। ডঃ বার্ণি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সংগীতের ইতিহাস' এ বলেছেন-

"পৃথিবীতে মনুষ্যোদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠসংগীত সমূদ্ভুত হয়েছে। ভাষা সৃষ্টির হবার পূর্বে সুখ-দুঃখ আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি মনের যাবতীয় আবেগ প্রকাশার্থে এক এক প্রকার দীর্ঘস্বর স্বাভাবিকরূপে ব্যবহৃত হইতো এবং সেই সকল আবেগসূচক স্বর মানুষ মাত্রেরই প্রায় একরূপ। কেবল বয়স, লিঙ্গ, শারিরীক গঠনের বিভিন্নতায় স্বরের গম্ভীরতা ও তীব্রতায় প্রভেদ হয় মাত্র"[৩]

১.২ বাংলা সংগীতের ধারা

বাঙালির সৃজনশীলতার যে বিপুল বিকাশ তা প্রকাশ পায় গানের ভিতর দিয়ে। বহুযুগ আগে থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বাংলাগানের বিকাশ ঘটেছে। এই বিকাশের রূপ পরিগ্রহ করা একদিনে সম্ভব হয় নি। খণ্ড খণ্ড মর্মবস্তুকে মিলিয়ে একটি সামগ্রিক রূপ দাঁড় করানোর মাধ্যমে বাঙালির আত্মপরিচয়ের রূপ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই সূত্রসন্ধানের কাজে বাঙালির চেষ্টা ও একে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করার যে প্রয়াস তা সাংগীতিক উচ্ছাসসমূহকে ভাবগভীরতার সঙ্গে মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বাংলাগানের বিকাশে হিন্দুস্তানি সংগীত পদ্ধতির অনুসরণ আমাদের পথকে আরো প্রশস্ত করে। তবে এর আগের যুগে প্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের প্রভাবও বাংলা গানে পড়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ সময় রবীন্দ্রনাথের সুপ্রশস্ত সংগীত রচনা উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমসাময়িক অন্যান্য রচয়িতাগণ এই ধরণের দরবারী সংগীতের মায়ায় আবদ্ধ হতে পারেননি বা থাকেননি। তারা তাদের স্বার্জিত বেশিষ্ট্য দ্বারা পৃথক হতে চেয়েছেন। ঠিক তেমনি হিন্দুস্তানী টপ্পার অনুকরণ করেও বাঙালি তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেনি। কোন না কোন দিকে তারা বাংলা টপ্পাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। শিল্পচর্চায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি মনস্বীগত গীত সাহিত্যে অঞ্চল বহির্ভূত উপাদানকে প্রশ্রয় দেননি।

---

[২] তদেব, পৃষ্ঠা-০৬

[৩] ডঃ শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত; প্রথম খন্ড*, আদিশক্তি প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রকাশ ২০ জুলাই ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে সংগীত ধারার মধ্যে মার্গ ও দেশী এ দুটি ধারা গ্রামজাত সভ্যতা থেকে গড়ে উঠেছে। এ সকল সংগীতের কথা ও সুরকে সমান প্রাধান্য দিয়ে গাওয়ার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আর এই আদর্শে মীননাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সংগীত রচনা করে এসেছেন এবং এই ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই সংগীত বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে। কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ, সে পথেই বাংলা কাব্য সংগীতের মূখ্য ধারার বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়া সাংগীতিক বিকাশ বলতে যা বোঝায় তারও একটি রূপ আমরা বাংলা সংগীতে পাই। হিন্দুস্তানী সংগীত ধারায় যেমন-ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, দাদ্‌রা, গজল এসব দেখা যায়, তেমনি এর সাথে আঞ্চলিক সংগীতের সংমিশ্রণে কিছু শঙ্করজাতীয় সংগীতেরও উদ্ভব হয়। তবে আধুনিক দরবারী সংগীতের পূর্ববর্তী যে সংগীতধারা, তারও প্রচলন দেখা যায় এই সময়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নবজাগরণের সময় শিক্ষিত সাংগীতিকদের অনুভূতির বিকাশের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বাংলা গান বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। বাংলা শীলিত সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কথা ও সুরের সমন্বয় বা কাব্যধর্মীতা, যার প্রধান উদ্যোক্তা রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)। এই রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর রচিত টপ্পা গানের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যসংগীতের সূচনা। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ দিকপালের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলা গান পরিপূর্ণতা পায়। এছাড়া লোকায়ত রচনার অন্যতম সাধক লালন ফকির ও তাঁর শিষ্যগণ বা মরমিয়া বাউল ফকিরদের রচিত বিভিন্ন গানের অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশশৈলী সমান্তরালভাবে বাংলা সংগীতে পরিলক্ষিত হয়।

ভাবপ্রবণ জাতি হিসেবে বাঙালির একটা আলাদা পরিচয় আছে, যারা জাতিগতভাবেই গীতিপ্রধান । তাই গীতির মধ্য দিয়েই বাঙালির সর্বোত্তম পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা অন্যকোনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। মীননাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালির প্রকাশধর্মীতাকে সার্থক করেছে এই গান বা গীতিকবিতা। তবে এর প্রথম নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় চর্যাপদকে, যা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের প্রাচীনতম রূপ। প্রাচীনকালে চর্যাপদের আগেও যে সংগীতচর্চা হত তা নানারকম শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। গুপ্ত বা পাল যুগে নানা নৃত্যরত শিল্পকর্ম বা এর ভঙ্গি ও এসময়ের বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন দেখে সংগীতের প্রতি আগ্রহ বোঝা গেলেও সে সকল গীতশৈলী বা সুর কেমন ছিল তা জানা যায় না।

তাছাড়া সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এই উপমহাদেশ যে বেশ স্বচ্ছল তা বিভিন্ন জনপদে সংস্কৃতি চর্চা দেখে আঁচ করা যায়। বরেন্দ্র, পৌন্ড্রবর্ধন, রাঢ়ভূমি এই এই তিনটি জনপদ নিয়ে যে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীতের

Dhaka University Institutional Repository

যে ধারা তা মৌর্য ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। তবে সে সময় রাগসংগীত ও দেশীসংগীত আদান প্রদানের মাধ্যমে সেই সমান্তরাল ধারা আরও প্রশস্ত হয়েছে। এ সময় কিছু আদিবাসী সংগীতের সাথে মিল রেখে দেশীসংগীতও ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, রাজা বাদশাহ্দের দরবারগুলোতে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও কলাবন্তদের দ্বারা রাগ সংগীত গায়ন প্রচলিত থাকায় সেসময় রাগসংগীতের স্পর্শে দেশীসংগীতও সমৃদ্ধতর হয়।

সেই সময় (আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) বিভিন্ন গীতরীতি যেমন- চর্যাগীতি, নাথগীতি, চাঁচড়, হোলি প্রভৃতি গীতধারার প্রচলন থাকলেও শুধু চর্যাগীতি ছাড়া বর্তমানে তার অধিকাংশই বিলুপ্ত । তাই শেষ পর্যন্ত চর্যাগীতিকে বাংলাভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলাগান বলা যায়। যার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলা গান সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে। এছাড়া জয়দেবের গীতগেবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলি, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হওয়ার পর বাংলাগানে অধিক সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দ ও মঙ্গলকাব্য সে সময় বাংলা রাগসংগীত হিসেবেই প্রচলিত ছিল। আর তাই হালের চাহিদা অনুযায়ী বাংলা রাগসংগীত হিসেবে গীতগোবিন্দ ও মঙ্গলকাব্য সর্বাধিক গাওয়া হতো।

পাল যুগে যখন পালবংশের রাজাদের কীর্তিগাঁথা গাওয়া হত, সে সময় দেশী সংগীতও সমৃদ্ধির পথে ধাবমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে দেশীসংগীতে রাগসংগীত ও রাগসংগীতে দেশীসংগীতের মিশ্রণের মাধ্যমে উভয় ধারাই সমান্তরালভাবে বিকশিত হতে থাকে।

বাংলাগানের এই ক্রমবিবর্তনের ধারাকে মোট তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায়। যেমন- প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ যা বর্তমান অবধি প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় ৮ম থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত আদি বা প্রাচীনযুগ বলা হয়। এসময় চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রচলন শুরু হয়। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, তুলসী দাস, মীরাবাঈ প্রমুখ ব্যক্তিদের আবির্ভাবের সময়কেই বাংলাগানের মধ্যযুগ বা মধ্যপর্ব বলা হয়। অন্যদিকে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, রাধারমন, হাসনরাজা, লালনফকির থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সময় পর্যন্ত যুগকে আধুনিক পর্ব বলে। যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বহমান। বাংলা গানের এই ক্রমবিবর্তনের ধারাগুলো অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১.২.১ চর্যাগীতি

বাংলা সংগীতধারার আদি ও প্রাচীন ধারা হিসেবে চর্যাপদ পরিচিত। চর্যাপদ বা চর্যাগীতি সাধারণত বৌদ্ধ সহজিয়া গীতি হিসেবে প্রচলিত। এই চর্যাগীতি প্রাচীন বিপ্রকীর্ণ গীতরীতির অন্তর্গত। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরীতি খ্রীষ্টপূর্বকালেও ভারতীয় উপমহাদেশে নাগরিক গানরূপে ভাষা-রাগ-তালকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। মূলত এই গান মহাযানী বৌদ্ধদের এক ধরণের আঞ্চলিক সংগীত যা রাগাশ্রয়ী ধর্মীয় গান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই গীতিরীতি সাধারণত 'সান্ধ্য' বা 'আলো আঁধারি' ভাষায় গীত হয়। চর্যাগীতির রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। তবে ধারণা করা যায়, চর্যাপদ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছে। চর্যাগীতির কলিবিন্যাস সাধারণত উদগ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ এই তিন ভাগে বিভক্ত এবং পদ্ধড়ী ছন্দে গঠিত। এই ছন্দে ষোল মাত্রা থাকে। চর্যাগীতিতে যেসকল রাগ ব্যবহৃত হয় তা হল-পটমঞ্জুরী, মল্লার, গুর্জরী, কামোদ, বরাড়ী ভৈরব, দেশাখ, রামক্রী, শবরী, অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্রী, ধানশ্রী, মালসী-গবুড়া ও বঙ্গাল। এই গীতিতে যেসব যন্ত্র বাজানো হয় তার মধ্যে 'পটহ' বা ঢোল এবং একতারাই অধিক উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মাদল, করন্ত, কসাল, দুন্দুভি, ডমরু, ডমরুলি, বীণা প্রভৃতি বাজানো হত বলে জানা যায়। যেহেতু চর্যাগীতি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রার্থনামূলক সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হতো তাই এই গীতিপদ্ধতি পাল রাজত্বের সময় অধিক বিস্তার লাভ করে। চর্যাগীতির গঠণরীতি মূলত একাধিক চরণ বিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত ও গীতিধর্মী। চর্যাগীতিতে প্রতি দুই লাইন শেষে 'ধ্রু' শব্দটি পাওয়া যায়। যা ধুঁয়া বা ধ্রুবপদের সংকেত বলে ইতিহাসবিদ **নীহাররঞ্জন রায়*** মনে করেছেন। জানা যায়, প্রত্যেক পদ গাইবার পর শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বারবার ধ্রুবপদ গাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতিতে মোট ৫১ টি পদ পাওয়া যায়। তবে আবিস্কৃত পুঁথিতে ৫০ টি চর্যায় মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে লুইপাদকেই আদি সিদ্ধাচার্য মনে করা হয়। ধারণা করা হয় চর্যার এ সকল কবি বা সিদ্ধাচার্যরা পূর্ব ভারত ও নেপাল রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। গঠণগত দিক থেকে বর্তমানকালের বাংলা গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের পরিবর্তে উদগ্রাহ, মেলাপক, সঞ্চারী ও আভোগ কলিগুলোর প্রচলন ছিল। এগুলোকে বলা হত ধাতু। এই চারটি ধাতুর মধ্যে উদগ্রাহ ও ধ্রুব সব গানে থাকলেও অন্য দুটি বাধ্যতামূলক ছিল না। এখানে লুইপাদ রচিত একটি পদের কয়েকটি লাইন উদাহরণস্বরূপ দেয়া যেতে পারে-

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চী এ পইঠো কা।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।[৪]

***নীহররঞ্জন রায়ঃ** https://en.wikipedia.org/wiki/Niharranjan_Ray বাঙালি ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও শিল্পকলা গবেষক পন্ডিত।

[৪] https://www.youtube.com/watch?v=Ka39I-A3Kbk

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-০১ ঃ চর্যাপদের পান্ডুলিপি

১.২.২ নাথগীতি

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নানা লৌকিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণে উত্থিত এক ধর্মের নাম নাথধর্ম। বিভিন্ন নাথ সিদ্ধাচার্য বা নাথ সিদ্ধগণের মাধ্যমে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই নাথ সাহিত্যের উদ্ভব বলে জানা যায়। তবে চর্যাগীতি সিদ্ধাচার্য ও নাথ সিদ্ধাচর্যের মধ্যে কয়েকজন অভিন্ন থাকায় অনুমান করা হয় যে, নাথগীতি ও চর্যাগীতি সমসাময়িক। নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথ হলেও নাথ পরম্পরায় প্রধান গুরু হচ্ছেন গোরক্ষনাথ। নাথগীতিকা সাধারণত দুটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। তার একটি ধারা মীননাথ এবং গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করে। ভবানীর অভিশাপে মীননাথের স্খলন ঘটলে গোরক্ষনাথ আপন বিদ্যা বলে মীননাথকে সেই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনা মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি নামেও খ্যাত। অপর ধারাটি রাজা মানিকচন্দ্র, রানি ময়নামতি ও তাঁদের পুত্র গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ এই ধারার মুখ্য কাহিনী যা মানিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতির গান বা গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি নামে খ্যাত। গান হিসেবে নাথগীতি অত্যন্ত সহজ সুরে রচিত। এই গান ছড়ার মত করে ছন্দে ছন্দে বা পাঁচালির মত সুর করে পড়া হতো। তবে সেসময় নিবারণ দে নামক একজন গায়ক প্রচলিত গায়নরীতি ভেঙে বিভিন্ন স্থানে ঝুমুরের মত করে দ্রুত থেকে অতি দ্রুত লয়ে দুই স্তবক গেয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতেন। তবে চর্যাগীতি যেমন বাংলা গীতি বা গীতিকবিতার উৎসস্বরূপ, নাথগীতিকাও তেমনি বাংলা আলেখ্য বা সংগীতের উৎসস্বরূপ। দুটি ধারাই বাংলা গানে সমানভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

চিত্র-০১ঃ

https://www.google.com/search?q=charyapada&rlz=1C1CHBD_enBD799BD800&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Njsc3XzsWmENaM%252CPK2Jely1Rrqu2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT6LVY7jNO5kdNUCY4U7q2ffz-LHw&sa=X&ved=2ahUKEwiUivrn_7vwAhWFbisKHdFwDGkQ9QF6BAgdEAE#imgrc=Njsc3XzsWmENaM

Dhaka University Institutional Repository

১.২.৩ গীতগোবিন্দ

আনুমানিক ১২ শতকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে লিখিত গ্রন্থই গীতগোবিন্দ নামে পরিচিত। গ্রন্থটি সুললিত সংস্কৃত ভাষায় পদ্যাকারে রচিত। রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব এই গীতধারার রচয়িতা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কলি দ্বারা নিবদ্ধ। ধারণা করা হয় গীতগোবিন্দে আছে ১২টি সর্গ ও ৮০টি শ্লোক। এই ১২ টি সর্গ হলো- ১) সমোদদামোদর, ২) সক্লেশকেশব, ৩) মুগ্ধ মধুসূদন, ৪) স্নিগ্ধ মধুসূদন, ৫) সাকাংক্ষ পুন্ডরীকাক্ষ, ৬) কুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ, ৭) নাগরনারায়ন, ৮) বিলক্ষ্মলক্ষ্মীপতি, ৯) মন্দমুকুন্দ, ১০) চতুর চর্তুভূজ, ১১) সানন্দ দামোদর, ১২) সুপ্রীতিপীতাম্বর। উক্ত ১২ টি সর্গের মোট ২৪টি গান নিয়েই গীতগোবিন্দ রচিত। তাই এগুলোকেই গীতগোবিন্দের প্রাণস্বরূপ বলা যায়। গ্রন্থটি গীতিসর্বস্ব বলে এর নামকরণও সার্থক। গীতিগোবিন্দ বিভিন্ন রাগ-তালের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- মালবগৌড়, বসন্ত, রামকিরি, কর্ণাট, দেশাখ, দেশ-বরাড়ী, গুণকরী, মালব ভৈরবী এবং বিভাস। আর এতে যে তালগুলো ব্যবহৃত হয় তা হলঃ- রূপক, নিঃসার, যৎ তাল, একতাল এবং অষ্টতাল। গীতগোবিন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর পদগুলিতে কাব্য ও সংগীতের একটি নিগূঢ় সমন্বয় ঘটেছে। এছাড়া গীতগোবিন্দের প্রধান ও মূল বিষয় এই গীতে মোট তিনটি চরিত্র রয়েছে। যেমন- রাধা, কৃষ্ণ ও সখি। এদের ছন্দোবদ্ধ কথোপকথন নিয়ে এই গীতগোবিন্দ রচিত হয়েছে।জার্মন কবি **গ্যেটে*** এই কাব্যের অনুবাদ সংস্করণ পাঠ করে কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। জয়দেব রচিত এই গানের অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল-

গীতম্

(বসন্ত-রাগেন যতি-তালেন চ গীয়তে)

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলিন-কোমল-মলয়-সমীরে

মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটিরে।

বিহরিত হরিরিহ সরস-বসন্তে

নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং

সখী বিরহি জনস্য দুরন্তে"

বাংলা রূপান্তর (গান)ঃ

(রাগ-বসন্ত, যতি-তাল)

"ললিত লবঙ্গলতার পরশ মেঘে কোমল হয়ে ওঠে

মলয় সমীরে ভ্রমরফুল গুঞ্জরিত কুহু কুহু ধ্বনি।

মুখর করে কুঞ্জ কুটির, বিরহী সন্তাপি মধুমাসে

***গ্যেটেঃ** https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe কবি, দার্শনিক, নাট্যকার, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কূটনীতিবিদ।

যুবতী সঙ্গিনীর সনে নৃত্যরত বিহারী লীলমনি"।[৫]

চিত্র-০২ঃ গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি

১.২.৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীন সংগীতের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি সার্থক সৃষ্টি। বড়ু চন্ডীদাস (১৩২৫-১৪০২) রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে শ্রীকৃষ্ণসদর্ভও বলা চলে। কারণ এ সম্পর্কে সংগীতবিদ শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন,

> *"এই গ্রন্থটি কি কাব্য, সংগীত কি গীতিনাট্য-সবদিক থেকেই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের প্রাচীন সংগীতকলার অত্যুৎকৃষ্ট প্রচেষ্টার পরিচায়ক।"*[৬]

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংক্রান্ত পালাকারে রচিত বাংলা গীতিনাট্য হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর মূল প্রবন্ধটি 'সংগীত রত্নাকর' বা 'সংগীত দামোদরে' বর্ণনাকৃত ঝোম্বর বা ঝুমুর প্রবন্ধগীতির অনুসরণে রচিত। এর রচনাকাল সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ আধুনিক গবেষণায় একে খ্রীষ্ট্রীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা হয়। এই গীতিনাট্যের সকল গানই সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল আর গীতিনাট্য রচনাকালে শীর্ষদেশে প্রবন্ধের নাম, রাগের নাম ও তালের নাম লেখা হত। জানা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট ৪১৮ টি পদের মধ্যে প্রতিটি পদে সুর তাল ও অন্যান্য পরিবর্তন করে কাঠামোতে বৈচিত্র্যও আনা হয়েছে। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়। জানা যায়, বসন্তরঞ্জন রায় নামক একজন এই ধারার নাম **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** দিয়ে থাকেন । তবে এ নিয়ে বেশ মতভেদ ও হয়েছিল সেসময়। অনেকের মতে, যেমন- বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের ধারণা অনুযায়ী এই গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল **'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'**। তবে যেহেতু **'কৃষ্ণকীর্তন'** নামে একটি গ্রন্থ ইতিপূর্বে থাকলেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না, তাই শেষমেশ বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক লিখিত নামটিই গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাঁর বক্তব্য ছিল,

---

[৫] মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা, মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২৫।

[৬] শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, বাংলার সংগীত (প্রচীন ও মধ্যযুগ); কলকাতা; বাংলার সংগীতমেলা কমিটি; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬, পৃ-২৩

চিত্র০২ঃhttps://en.wikipedia.org/wiki/Gita_Govinda#/media/File:Odissi_poet_Gopalakrusna's_handwritten_Gitagobinda_Pothi.jpg

"পুঁথির আদ্যন্তহীন খন্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুঁথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চন্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চন্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য যে লীলা কীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের নামকরণ অসমীচীন নয়।"[৭]

গ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রে বসন্তরঞ্জনের নাম পাওয়া গেলেও রচয়িতা হিসেবে বড়ু চন্ডীদাসকেই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট ৪১৮টি পদ পাওয়া যায়। প্রতিটি পদেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সুর, তাল, লয় এর পরিবর্তনের সাথে গায়নরীতিরও বৈচিত্র্য আনা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোট ১২টি খণ্ডে পাওয়া যায়। এগুলো হল জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বানখণ্ড, বংশীখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড। প্রতিটি খণ্ডই অনেকগুলো গানের সমারোহে তৈরী। যেমন- জন্মখণ্ডে ৮টি গান, তাম্বুলখণ্ডে ১৩টি গান, দানখণ্ডে ২০টি, নৌকাখণ্ডে ৪টি, ভারখণ্ডে ৭টি ছত্রখণ্ডে ৪টি, বৃন্দাবনখণ্ডে ৬টি, কালীয়দমনখণ্ডে ৩টি। এভাবে অনেক গান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন খণ্ডে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দের সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু মিল পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, গীতগোবিন্দের প্রেরণায় রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনায় গীতগোবিন্দের প্রভাবের কারণে উভয় গীতশৈলীর গঠণকলা, গায়নরীতি প্রভৃতিতে সাময়িক মিল লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে আদিরস জারিত গ্রাম্য অশ্লীলতাদুষ্ট হলেও আখ্যানভাগের বর্ণনানৈপুন্য ও চরিত্রচিত্রণে মুন্সিয়ানা আধুনিক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহু উদ্ধৃত মর্মস্পর্শী একটি পদের কিয়দংশ উদাহরণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে-

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।।" [৮]

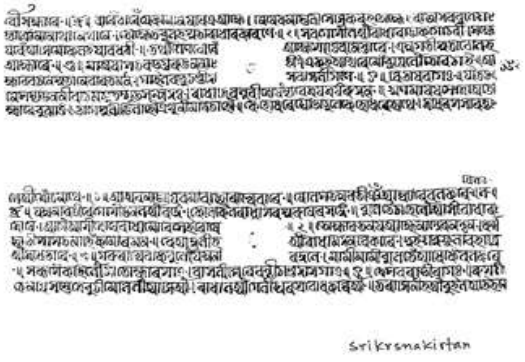

চিত্রঃ ০৩ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের পান্ডুলিপি

[৭] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8

[৮] তদেব

চিত্র-০৩ঃ https://roar.media/bangla/main/book-movie/sreekrishnakirtan

১.২.৫ কীর্তন

"কীর্তন" শব্দের আভিধানিক অর্থ হল গুণকথন বা যশ উপস্থাপন। ইষ্টদেবের গুণগাঁথাই হচ্ছে কীর্তন গান। ধারণা করা হয় আনুমানিক ষোড়শ শতক থেকেই নানা ধরণের সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রবন্ধকে আশ্রয় করেই কীর্তন গানের উদ্ভব হয়েছে। জানা যায়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কীর্তন গানের প্রথম উৎস। এছাড়াও বড়ু চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রচিত বহু কীর্তন গানেরও সন্ধান পাওয়া যায়। উভয় বাংলাতে কীর্তন গানের অধিক প্রচলন থাকায় অনেকে কীর্তনকে বাঙালির নিজস্ব গান মনে করেন । সুর ও ভাবের সাথে কথার উপর কথার জাল বিছিয়ে মনের আবেগ ও আকুতি মেশানো সংগীতই হল কীর্তন। বিভিন্ন রাগের উপর ভিত্তি করে হলেও মনের আবেগকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। রাগসংগীত ধারার ধ্রুপদ খেয়ালের মত কীর্তনেও বিভিন্ন ঘরানার নাম পাওয়ার যায়। যেমন- গরাণহাটি, মনোহরাশাহী, রেনেটি, মন্দারণি, ঝাড়খন্ডি প্রভৃতি ঘরানা। তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের একটি ধারা গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গবন্দনাসহ রাগ-তাল ও সংক্ষিপ্ত আলাপ সহযোগে যে নতুন 'বিষ্ণুপদী' গানের প্রচলন তা রাজশাহীর বাসিন্দা নরোত্তম দাস কর্তৃক প্রবর্তিত। এছাড়াও ধারণা করা হয় ৫টি ঘরানার মধ্যে গরাণহাটি ধারার সূচনা তিনিই করেন। এরপর বীরভূমের জ্ঞানদাস মনোহরশাহী ধারাটির প্রবর্তন করেন। তার কিছুকাল পরেই বর্ধমানের বিপ্রদাস ঘোষ সূচনা করেন রেনেটি ধারার। মান্দারণ সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয় মান্দারণি ধারার এবং ঝাড়খণ্ড জেলায় উদ্ভব হয় ঝাড়খণ্ডি ধারার কীর্তন।

১.৩ মধ্যযুগীয় বাংলা গান

১.৩.১ মঙ্গলকাব্য

সেসময় 'মঙ্গল' গানেরও একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সেখানেও কিছু নির্দিষ্ট গীতরীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। জানা যায়, প্রাচীনকালে দেবদেবী বিষয়ক বিভিন্ন গান 'মঙ্গল' সুরে গাওয়া হত তাই একে মঙ্গল গান বলা হয়। মঙ্গল গান সাধারণত আখ্যায়িকা কাব্য হিসেবে পরিচিত। প্রথম দিকে কিছু স্তব স্তুতি ছাড়া অবশিষ্ট সব আখ্যায়িকা। মঙ্গল গানের এক একটি গীতিকাহিনী বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। এসব মঙ্গল কাব্যের পালাবিভাগও স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্য সাধারণত বিশেষ কোন দেবদেবীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এসব দেবদেবীদের সাধারণত 'নিম্নকোটি' দেবদেবী হিসেবে পূজা করা হত। আর এ সকল দেবদেবীদের পূজা অর্চনা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই মঙ্গলকাব্যগুলির মূল লক্ষ্য ছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। এইসব দেবতাদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে বাংলার আঞ্চলিক হিন্দুত্ববাদের অন্তর্ভূক্ত হয়। বিভিন্ন ধরণের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অন্যতম হলো-চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এছাড়া রয়েছে সূর্যমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল। সাংগীতিক দিক দিয়ে মঙ্গলগানে গীতরূপের চেয়ে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে বেশি উল্লেখ আছে। যেমন-

সানাই, বাঁশি, মৃদঙ্গ,শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা, রবাব, দোতারা, সেতার, ডম্ফ বা ডফ, খমক প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্য ছিল সকল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারক এবং বাংলা ভাষার ক্রান্তীয় মধ্যযুগীয় বহিঃপ্রকাশ। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যখন তাঁর সংগীতধারাকে উচ্চবর্গের শ্রোতার কাছে আদরণীয় করেন তখন জনসাধারণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যাতা কমতে শুরু করলো। আর সে সাথেই মঙ্গলগানের যুগও শেষ হলো।

১.৩.২ শাক্ত পদাবলি

শাক্ত পদাবলির সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা হলেন রামপ্রসাদ সেন (আনুমানিক ১৭২০-১৭৮১)। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন এমন একজন কবি যাকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র **'কবিকিঙ্কন'** উপাধিতে ভূষিত করেন এবং এই শাক্তসংগীতগুলি রামপ্রসাদ সেনের গান হিসেবেই প্রচলিত ছিল। তাঁর গানের মুখ্য চরিত্র ছিলেন 'মা কালী' এবং যাকে তিনি তাঁর গানে কন্যারূপে বর্ণনা করেন। শাক্ত পদাবলিতে প্রকৃতপক্ষে শক্তিতত্ত্বই প্রধান। শাক্ত কবিরা প্রথমে সাধক, পরে কবি। তাঁরা বিভিন্ন সাধনালব্ধ সত্যকে ব্যাক্তিগত অনুভূতি দ্বারা কাব্যিক ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে সংগীতে পরিণত করেন। বাংলায় তন্ত্র সাধনা প্রসারের সমসাময়িক পর্যায়ে ভক্তসাধক কবির মনে কালীমূর্তি প্রাধান্য লাভ করে। এই অঙ্গের সংগীতের মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত রূপ হলো- মাতৃসংগীত, কালীসংগীত, চণ্ডীগীতি, মালসী গান, বিজয়া, আগমনী প্রভৃতি। তাঁর রচনার সরল ধারা জনসাধারণের কাছে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। তার সাথে সুরের রাগরাগিনীর নৈপুন্য থাকলেও লৌকিক আবেদনের কমতি ছিল না। তাঁর গানের সুরে কিছুটা কীর্তনাঙ্গ সুরও নতুনভাবে ধরা পড়েছে। শ্যামাসংগীতের সাথে রামপ্রসাদের এই গান বাংলাগানে এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

১.৩.৩ টপ্পাগানঃ

টপ্পাগান হলো কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। এই গানের সাথে পাঞ্জাব অঞ্চলের মূল গানের মিল থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। শোরী মিয়া নামে একজন সংগীতজ্ঞ মূল টপ্পা ধারার উদ্ভাবন করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলায় টপ্পা গানের প্রচলন করেন রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)। তবে বাংলা টপ্পার আদি পুরুষ হিসেবে কালী মির্জাকেও গণ্য করা হয়। কারণ তিনি নিধুবাবুর অনেক আগে থেকেই বাংলা টপ্পার প্রচলন শুরু করেন। কিন্তু নিধুবাবু কর্মক্ষেত্র ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে ১৭৯৪ সালে টপ্পার প্রচলন শুরু করেন। কালী মির্জা এবং নিধুবাবুর পর বাংলা টপ্পার হাল ধরেন শ্রীধর কথক। তিনি পরম যত্নের সাথে কালী মির্জা ও নিধুবাবুর টপ্পাকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর গানে নিধুবাবুর প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায়। টপ্পার বিষয়বস্তু হিসেবে মূলত

স্বাভাবিক করুন রস, প্রেম ও বিরহ প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়। টপ্পার উপযোগী বিশেষ কিছু রাগ হলো ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কালিংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়া প্রভৃতি। বাংলার জনপ্রিয় কিছু টপ্পা হলো-

- নানান দেশের নানান ভাষা
- পিরীতি না জানে সখী
- আমি আর পারি না সাধিতে এমন করিয়ে
- ঋতুরাজ! নাহি লাজ, এ কি রাজনীতি
- মধুর বসন্ত ঋতু! হে কান্ত! যাবে কেমনে
- অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব
- যাও! তারে কহিও, সখি, আমারে কি ভুলিলে[৯] প্রভৃতি।

১.৩.৪ কবিগান

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বা গান উভয়ই ছিল একই ধরণের। সেসময় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নোত্তরমূলক একপ্রকার গান প্রচলিত ছিল, যাকে বলা হত 'কবিগান'। এই গান মূলত বাংলা লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা। একটি প্রতিযোগিতামূলক গানের আসরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই গান রূপায়িত হয়। এ গানের পরিবেশনকারিদের মূলত 'কবিয়াল' বলা হয়। এই কবিয়ালদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা মুখে মুখে পদ রচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে সুরারোপ করে গেয়ে থাকেন। এই গানের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ মনে করেন এই গান পশ্চিমবঙ্গের আবার অনেকের মতে এ গান নদীয়া বা শান্তিপুরের 'খেউর' গানের প্রবর্তিত রূপ। তবে ধারণা করা হয়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় সর্বপ্রথম কবিগান ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করে । এই নবধারার গান সেই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধারার আদি কবি হিসেবে গোঁজলা গুঁইকেই ধারণা করা হয়। আবার অনেকে কবিগানকে বিভিন্ন ধারার সাংগীতিক মিলন হিসেবেও বিবেচনা করেছেন। এগুলো হলো- তরজা, পাঁচালি, খেউর, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কাগীতি ইত্যাদি। এই গানে একদিকে যেমন দেবদেবীর লীলা বর্ণিত হয় অত্যন্ত ভক্তিরস নিয়ে অন্যদিকে মানবীয় স্থুল রুচিরও যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এতে দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নোত্তরমূলক গানের মধ্যে একপক্ষ প্রশ্ন করে অপরপক্ষ উত্তর দেয়। এই প্রতিযোগিতায় ৪টি স্তর বা পর্যায় রয়েছে -

১. গুরুদেবের গীত,

[৯] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8#%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%9F%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE

২. সংখী সংবাদ

৩. বিরহ ও

৪. ভাঙড়।

আর এসব পর্যায় অব্যাহত রাখতে সেসময়কার যেসব কবিয়াল ছিলেন তাঁরা হলেন- রামজী দাস, ভবানী বণিক, রাসু, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রমুখ।

১.৩.৫ আখড়াই ও হাফ আখড়াই গান

কবিগান ছাড়াও মধ্যযুগে বাংলায় "আখড়াই" বা "হাফ আখড়াই" গানেরও বেশ প্রচলন ছিল। এই গানের অর্থ হচ্ছে মজলিশী গান। ১৬শ শতকের আগ থেকেই এই গানের প্রচলন ছিল। তবে সেসময় **'আইন-ই-আকবরী'** গ্রন্থে এ গানের রূপ ও প্রচলন সম্পর্কে প্রথম জানা যায়। এই **'আইন-ই-আকবরী'** গ্রন্থের প্রণেতা আবুল ফজলের লেখনী থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের একটি নৃত্যপদ্ধতি ছিল 'আখারা' যা থেকে এই আখড়াই গানের উৎপত্তি। এই নৃত্য উচ্চ অভিজাত বর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে ১৮শ বা ১৯শ শতকে যে 'আখড়াই' গান সম্বন্ধে জানা যায় তা গান হিসেবেই প্রচলিত ছিল, কোনরূপ নৃত্যের সংস্পর্শ এতে ছিল না। এক্ষেত্রে নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু এই 'আখড়াই' গানকে ভেঙে 'হাফ আখড়াই' গানের প্রচলন করেন। তিনি কোনরূপ জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা না করেই এ ধারার গান তৈরি করেন। 'আখড়াই' ও 'হাফ আখড়াই' গানের পার্থক্য হল আখড়াই গানে রাগ-রাগিনীর তেমন প্রচলন নেই আর হাফ-আখড়াই গানে রাগে-রাগিনীর প্রচলন রয়েছে। তাই এ গান তখনকার মানুষের কাছে তুলনামূলক সরল ও সহজবোধ্য হয়েছিল। তবে মোহনচাঁদের পরে হাফ আখড়াই গান খুব বেশীদিন স্থায়ীত্ব পায় নি।

১.৩.৬ যাত্রাগান

যাত্রা মূলত লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। আখড়াই গান প্রচলনের কিছুদিন পরে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাগানের আরেক অধ্যায় যাত্রাগানের পথচলা শুরু হয়। যাত্রার প্রচলন ষোড়শ শতকে শুরু হলেও এর প্রসার ঘটে সপ্তদশ শতকে। মূলত দেববেবীর পূজা উপলক্ষে শোভাযাত্রা বা নাট্যগীতিকে যাত্রাগান হিসেবে বলা হয়। ভারতচন্দ্রের 'চন্ডী' নাটকে অষ্টদশ শতাব্দীতে যাত্রাগানের আনুষ্ঠানিক পদযাত্রা শুরু হয়। এ পালায় সংস্কৃত শ্লোকপূর্ণ কথার সন্ধান পাওয়া যায়। এসময় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রমুখ বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তবে তাঁরা যে ধরণের গীতরীতি ব্যবহার করেছেন তা কিছুটা কীর্তন ঢঙেরও বলা যেতে পারে। যাত্রাদল গঠণের জন্য একজন উদ্যোক্তা থাকেন যাকে 'মালিক' বা

'সরকার' বলা হয়। আর দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে বলা হয় 'অধিকারী'। যাত্রাদলে শিল্পী, কলাকুশলীসহ মোট ৫০/৬০ জন লোক থাকে। যাত্রাগান সাধারণত খোলা আসরে সোচ্চার কণ্ঠে অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে অভিনয়, সংগীত ও বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রাগানের প্রসারের সমসাময়িক অবস্থায় পাচাঁলি গানেরও প্রচলন শুরু হয়। সে সময় দাশরথি রায় নব্য পাঁচালি রচয়িতা হিসেবেও বেশ খ্যাতিলাভ করেন। গ্রাম্য ধারায় কবিগান, পাচাঁলি প্রভৃতি সুরের সংস্পর্শ না থাকলেও কলকাতায় এসে এ সকল গানে রাগসংগীতের ছোঁয়া লাগে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সুরগুলোকে আশ্রয় করে থাকে।

১.৪ আধুনিক যুগের গান

ভারতীয় রাগসংগীতের ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় সংগীতের পরে আসে লঘু সংগীত। আর লঘু সংগীতের মধ্যে বাংলাগানের ভূমিকা অনেক। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলা গানের ধারায় দুটি ভাগ দেখা যায়। একভাগে দেখা যায় গ্রাম্যধারা, অন্যদিকে দেখা যায় কলকাতায় ইংরেজ আধিপত্য। বাংলাগানের এই ধারার অববাহিকায় নিধুবাবুর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি পূর্বের পৌরাণিক নায়ক নায়িকা ব্যবহারের ধারা বদলে সাধারণ নব মানব-মানবীকেন্দ্রিক বাংলা কাব্যসংগীতের নতুন যুগের প্রচলন করেন। নতুন উপাদান যুক্ত হলেও কথা ও সুরের সমান মর্যাদা দেবার জন্য বাংলা কীর্তনে ব্যবহার্য মোটা দানার তান ব্যবহার করেন। বাংলা টপ্পারীতিতে নিধুবাবুর পরই কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক এর বিশেষ খ্যাতি লক্ষ্য করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতের টপ্পার সমসাময়িক ব্রহ্মসংগীতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। জানা যায়, এই ব্রহ্মসংগীত রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনায় গীত গান হিসেবে ব্যবহার হত। তিনি ব্রহ্মসংগীতকে শুধু রাগ সংগীতের ভিত্তিতেই রচনার জন্য স্বীকৃতি দেন।

ব্রহ্মসংগীতে শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীতের সরাসরি অবদানের মাধ্যমে বোঝা যায় যে শাস্ত্রীর সংগীত বাংলায়ও কতখানি অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতার রেশ ধরে বাংলা গানে 'টপ খেয়াল' নামে একটি ধারার উন্মোচন হয়। যা হিন্দুস্তানী টপ্পা ও খেয়াল রীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। তবে টপ খেয়াল বাংলার নিজস্ব গায়নরীতি। ঠাকুর পরিবারে এই ব্রহ্মসংগীতের বেশ কদর লক্ষ্য করা যায়। জানা যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অনুগামী বিষ্ণু চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ব্রহ্মসংগীতে ধ্রুপদের ধারা যুক্ত করেন এবং ধীরে ধীরে সেই ধারাই প্রাধান্য লাভ করে। তবে পরবর্তীকালে রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী ও অন্যান্য গুণীজনদের সহায়তায় খেয়াল ও টপ্পা আঙ্গিকের ব্রহ্মসংগীতও রচনা করা হয়।

এরপর উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লঘু সংগীতের প্রচলন শুরু হয়। জাতীয়তাবোধ জাগরণে দেশাত্মবোধক গানের যাত্রা শুরু হয়। সেসময় ঈশ্বর গুপ্তের অনুরাগীগণ টপ্পাঙ্গে দেশাত্মবোধক গানের প্রচলন করেন। ঠাকুরবাড়িতে যেসব দেশাত্মবোধক গান রচিত হতো বিষ্ণু চক্রবর্তী তাতে ধ্রুপদী সুরের প্রয়োগ করতেন। ধীরে ধীরে নবাব ওয়াজেদ আলী খাঁ কলকাতায় বসবাস শুরু করলে দিল্লী ও লক্ষ্মৌর সংগীতচর্চা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং সেসময় কলকাতাই সংগীত ও নৃত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

পরবর্তীকালে দেশী রাগ ও সুরের সাথে পাশ্চাত্যের নানা সুরের সামঞ্জস্য করে বাংলাগানে ঐতিহ্যবাহী ধারার প্রচলন শুরু হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম সকলেই এর সংমিশ্রণের মাধ্যমে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন। আর এভাবেই আধুনিক বাংলাগানের উৎস দুয়ার খুলে যায়। এদিকে বাংলার লোকায়ত সুর যেমন বাউল কীর্তন সুরের সঙ্গে একাত্মতা করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন অন্যধারা। স্বদেশী গানে এধরণের সুরের সংমিশ্রণ ঘটায় সংগীতকে দিয়েছে লোকায়ত জনপদের প্রাণান্তকর প্রতিষ্ঠা। বাংলাগানের জগতে সৃষ্টি করেন এক বিশেষ গীতরীতি।

বিংশ শতকে দেখা যায় বাংলা গানে নবযুগের সূচনা। শোনা যায়, বাংলাগানে দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম পাশ্চত্য সংগীতিরীতির সাথে বাংলারীতির সুর মিশ্রণ করেন। এর সাথে সাথে রজনীকান্ত কীর্তন ও টপ্পার সুরের মিশ্রণ করেন যা শান্ত রসাত্মক ভক্তিমূলক সংগীত হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে কিংবদন্তী নজরুল যেমন রাগরাগিনীর মিশ্রণ করেন, তেমনি বাংলায় "গজল" ও সৃষ্টি করেন। তবে তিনি গানের কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরবী ও পারসীয় সুরকেও বাংলায় ব্যবহার করেছেন। এমন বিখ্যাত সংগীতগুণীদের বিভিন্ন ধারার সংগীত সৃষ্টির পর আরও অনেক সংগীতগুণীর আবির্ভাব হয় যাঁদের গান বাংলা লঘু সংগীতে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে।

বাংলাগানের এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারা বা বিশেষায়িত গানের প্রবাহ বইতে শুরু করে। আধুনিক গান, দেশাত্মবোধক গান, জীবনমুখী গান, শিশুতোষ গান, ব্যান্ডসংগীত প্রভৃতির বেশ জাগরণ দেখা যায় এ সময়ে। যা সাধারণত লঘু প্রকৃতির সংগীত হিসেবেই বেশি প্রাধান্য পায়। বাংলাধারার গানগুলোর বিস্তৃতি বহু সময় ধরে বহমান। দেশাত্মবোধক গানগুলো দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনন তৈরিতে সাহায্য করে। আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অর্জনের সেই ইতিহাস তুলে ধরে দেশের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে। এমন কিছু দেশের গান হল-এক নদী পেরিয়ে, সবকটা জানালা, বিজয় নিশান উড়ছে ওই, এই বাংলা রবি ঠাকুরের প্রভৃতি। জীবনমুখী গানগুলো জীবনের কথা বলে, জীবনে পাওয়া না পাওয়ার কথা

বলে, সাধারণ মানুষের কথা বলে। তাই এমন অনেক গান আছে যা জনমানুষের মনের কথাকেই ফুটিয়ে তোলে।

শিশুতোষ গান হল শিশুদের উপযোগী গান। যে গান শিশুর মানসিক বিকাশে সহযোগিতা করে, যে গান শিশু ও তার পরিবারের যোগাযোগে সহায়তা করে। মোটকথা, শিশুর মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সুরে সুরে যে ছন্দোবদ্ধ কথার বুনন তাই শিশুতোষ সংগীত। শিশুতোষ সংগীতের রচয়িতার কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে সলিল চৌধুরী সকলেই শিশুদের মস্তিষ্কে সহজে গ্রহণযোগ্য এমন কিছু গান রচনা করেছেন যা পরবর্তীতে শিশুতেষে গান হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের পঞ্চকবিদের সবাই এমন কিছু গান বাংলা সংগীতধারায় উপহার হিসেবে রেখে গেছেন। যেমন-রবীন্দ্রনাথের 'আমরা সবাই রাজা', 'আয় তবে সহচরী' 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' 'হারেরেরে রেরে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' প্রভৃতি। এসব গান ঠিক শিশুতোষ গান হিসেবে রচনা না করে বিভিন্ন নাটকে স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এসব গানের এমনভাবে সুরারোপ করা হয়েছে যা শুনলে শিশুরা সহজেই ধারণ করতে পারবে। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ও কিছু গানের সুরারোপ শিশুশিক্ষার উপযুক্ত হিসেবে রচনা করেছেন। যেমন- 'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসী তরী' 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' রজনীকান্তের 'অনন্ত দিগন্ত ব্যপী অনন্ত মহিমাতব' 'আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত', অতুলপ্রসাদের 'যাব না যাব না যাব না ঘরে', 'আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন সাহসে?' নজরুল ইসলামের 'চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়', 'শুকনো পাতার নুপুর পায়ে', 'প্রজাপতি প্রজাপতি', 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' প্রভৃতি গানগুলো শিশুদের ধারণ উপযুক্ত করে রচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন লোকসংগীত, পল্লীগীতি প্রভৃতি গান ও শিশুদের মনে ধারণক্ষম করে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুদের জন্য কিছু ছড়া গান রচনা করেছেন বিভিন্ন গীতিকার সুরকারগণ যা বিশেষভাবে শিশুদের জন্যই তৈরী। যেমন-'আয় ঘুম নেড়ে চেড়ে', 'বোয়াল মাছের দাঁড়ি ধরে', 'হাতি নাচে ঘোড়া নাচে, নাচে বেঙির মাসি', 'দেঁতো ভূত বড় পাজি বসে থাকে গাছে', 'বাবলা দাদা গোঁ ধরেছে শিখেই ছাড়বে গান' প্রভৃতি। শিশুতোষ সংগীতের এসব ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ গবেষণাকর্মে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুতোষ সংগীত

শিশুতোষ সংগীত হচ্ছে শিশুদের উপযোগী সংগীত। শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সুর সংবলিত ছন্দোযুক্ত গানই হচ্ছে শিশুতোষ সংগীত। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শিশুতোষ সংগীত হল এমন এক প্রকার গান যা শিশু এবং কিশোর বয়সী শ্রোতাদের জন্য রচনা করা হয়। এসকল গানের সুরকার, গীতিকার এবং গায়করা মূলত প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে গায়ক কিশোর বয়সীও হতে দেখা যায়। শিশুতোষ সংগীত সাধারণত বিনোদন ও শিক্ষামূলক উভয়রূপেই কাজ করে। তবে শিশুরা যাতে তাদের নিজেদের এবং অন্যদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে তাই তাদের মানবিক ভাবধারা বজায় রেখে এই জাতীয় সংগীত রচিত হয়। বেশিরভাগ সংগীতই সাধারণত লোকমুখে প্রচলিত তবে শিশুদের শিক্ষামূলক সংগীত নামে একটি ধারাই রয়েছে যা ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

২.১ শিশুতোষ সংগীতের সংজ্ঞা

একটি শিশুর জন্মের পর তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য, চিন্তা শক্তির পরিধি বৃদ্ধির জন্য, তার চিত্তস্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক মন্ডল বা পরিবেশ। তাই আমরা সংস্কৃতিকে বলতে পারি চেতনার উৎস যা মানুষকে সংযুক্ত করে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। আপন অস্তিত্বকে ছড়িয়ে দেয় বিস্তৃততর স্থানে, দীর্ঘতর কালে। শিশুর মানসচরিত্রে এই পরিবেশের আবহ প্রথমেই আসতে পারে পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে। সংগীত সেই পরিবেশের সাথে একই সুতোয় গাঁথা। এই সংগীত বা সাংগীতিক আবহাওয়া প্রাথমিকভাবে শিশুর দৈনন্দিন মানসে প্রতিফলিত হয়। একটি শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে যে সংগীত কতটা গুরুত্ব বহন করে তা শিশুর মানসিক উন্নয়ন দেখেই বোঝা যায়। সংগীত শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনের সাথেই নয় আচার অনুষ্ঠানেও একটি বড় ভূমিকা পালন করে। খেলাচ্ছলে সংগীত শিশুদের মনে ভাললাগা তৈরি করে। নবজাতকরা ছড়া গান বা বিভিন্ন সংগীতিক সুরের সাথে তাদের অনুভূতির প্রকাশ করে। অল্পবয়সী শিশুরা সংগীতের তালে তালে তাদের শরীরকে স্পন্দিত করে। এরপর শিশুরা স্বভাবগতভাবে সংগীতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।

মূলতঃ শিশুতোষ সংগীত বা শিশুসংগীত হলো শিশুদের উপযোগী পরিবেশিত সুর বা ছন্দযুক্ত সংগীত। যদিও এর সুরকার ও গায়করা সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও শিশুর মানসচিত্রপটে যাতে শিশুসুলভ ভাব বজায় থাকে সেজন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকেন। ঐতিহাসিকভাবে বলা যায়, শিশুসংগীত বিনোদনমূলক এবং শিক্ষামূলক উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুসংগীতের মাধ্যমে শিশুদের নিজেদের সংস্কৃতি ও অন্যদের সংস্কৃতি জানতে উদ্বুদ্ধ করে। এর সাথে সদাচরণ, মানবিকতা শিখতে এবং সর্বোপরি শিশুর জৈবিক ঘটনা ও মনোজাগতিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

মানসিক বিকাশের দ্রুততার জন্য সংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর শিশুকালে এই সংগীতের সাথে আত্মীকরণ বিকাশে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এই সংগীত বা সাংগীতিক আবহাওয়া প্রাথমিকভাবে শিশুর বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে সকল ধরণের সংগীতই যে সব বয়সী শিশু ধারণ করতে পারবে এমন নয়। তাদের বোধগম্যতার গণ্ডির মধ্যে শিশুসুলভ সংগীতই সর্বাপেক্ষা কার্যকর। কারণ এসব সংগীতে শব্দযোজনা ও সুরযোজনার এক অপূর্ব শিশুসুলভ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। শিশুতোষ সংগীতের নানা উপাদানের মধ্যে ফুল, পাখি, পশু, কাল্পনিক চরিত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে সংগীতকে আরও চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আর এভাবেই শিশুতোষ সংগীত তৈরী হয়। আবার এমন কিছু সংগীত আছে যা সরাসরি শিশুতোষ সংগীত হিসেবে পরিগণিত না হলেও সুরের গঠণ ও চলনে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যার ফলে স্বভাবগতভাবে আমরা সেসব সংগীতকেও শিশুতোষ সংগীত হিসেবে ধরে নেই।

অনেক সময় শিশুতোষ ছড়াকেও আমরা শিশুতোষ গান হিসেবে বলতে পারি। ইংরেজিতে যাকে নার্সারি রাইমস্ (Nursery Rhymes) বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারত, ব্রিটেনসহ অন্যান্য অনেক দেশের শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজি নাটক রেকর্ড করা শুরু হয়। জানা যায়, এই নার্সারি রাইম কথাটি ইংরেজী ১৮ শতকের শেষ বা উনিশ শতকের শুরু থেকে বলা শুরু হয়। শিশুতোষ গানগুলো প্রথমে ছড়ারূপে প্রকাশ পায়। পরে সেগুলোতে সুর বসিয়ে গান আকারে রূপ দেয়া হয়। ১৮৯৯ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই ছড়াগুলোকে প্রথমে গ্রন্থভুক্ত করেন এবং এর নাম দেয়া হয় ***'খুকুমনির ছড়া'***। জানা যায়, এই গ্রন্থটিতে ভূমিকায় সর্বপ্রথম রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ছড়াকে সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সেসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে সুকুমার রায়ের ছড়া সংকলন করে ছড়াকে আরো গ্রহণযোগ্য স্থানে নিয়ে যান। এসকল ছড়াই পরবর্তীকালে সুরারোপ করে গানে রূপান্তর করা হয় এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *"খুকুমনির ছড়া"* বইয়ের অন্তর্গত কিছু ছড়া সুর দিয়ে সংগীতে রূপান্তর করা হয়।

"হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পারে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম"[১০]

[১০] যোগীন্দ্রনাথ সরকার, *খুকুমনির ছড়া*, বাংলাপ্রকাশ, ২০১৯, পৃষ্ঠা-০৪

"খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন মোদের কার বাড়ী?
আয়রে খোকন ঘরে আয়
দুধমাখা ভাত কাকে খায়।"[১১]

শিশুতোষ গান শুধুমাত্র শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই নয়, এই গানগুলো শিশুদের মনোজাগতিক বিকাশে বিস্তর সহায়তা করে। তাছাড়া **Chicago Tribune*** নামক একটি পত্রিকায় দেখা গেছে সংগীত এবং ছড়া খানিক যুক্তিতে একটি শিশুর মেধার ক্ষেত্রে গাণিতিক দক্ষতায়ও সহায়তা করে।

২.১.১ শিশুদের মানসিক বিকাশে সংগীত

"শিশু" শব্দটাই সরলতা ও পবিত্রতার আরশীস্বরূপ। শিশুদের মানসিক দিক এতটাই কোমল যে খুব সহজেই যে কোন জিনিস আকর্ষণ করতে পারে। খুব সাধারণভাবে দেখলে বলা যায়, মোটামুটি ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা সহজেই যে কোন জিনিস মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে। কারণ সে সময়টাতে বাচ্চাদের মস্তিষ্কে ধারণ করার মত পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একটি শিশু সময়ের সাথে সাথে পরিবেশগত কারণে যা শেখে তা ই তার মস্তিষ্কে দীর্ঘসময় স্থায়ী হয় এবং ধীরে ধীরে সে জায়গায় প্রশ্নস্ততা হ্রাস পায়। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার অভিজ্ঞতার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। নানা ঘটনার মাঝে সে সম্পর্ক ও সংযোগ মেলানোর চেষ্টা করে। এসময় শিশু আধো আধো বোলে কথা বলে। তাছাড়া শিশু তাঁর প্রথম জীবনে সুর খোঁজার চেষ্টায় নিবৃত্ত থাকে এবং যে কোন সুরের সাথে তারা সহজে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। যা শিশুর দ্রুত মেধা বিকাশে সাহায্য করে। এছাড়া সংগীত আরও যেভাবে শিশুর মেধা বিকাশে সহায়তা করে তা হল-

সংগীতের মাধ্যমে শিশুর অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি পায়, যেকোন শব্দ বা রঙ শিশু চিনতে পারে সুরের মাধ্যমে। এই সুর শিশুর মস্তিষ্ক ও সুরের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। সুরের সাথে সাথে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার শিশুকে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলে। শিক্ষার উপাদানের ভিন্নতা আনয়নেও সংগীত ভূমিকা পালন করে। জন্মের পর থেকেই শিশু তার বাবা মার কণ্ঠস্বর চিনতে পারে। বিভিন্ন শব্দ যখন সুরের সাথে উচ্চারণ করে শিশুকে ডাকা হয় তখন সে সেই সুরের সাথে মানসিকভাবে একটি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।

---

[১১] তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৩

* **Chicago Tribune**: https://www.chicagotribune.com/subscriptions/land-subscribe-evergreen/sem.html?track=ct_paidsearch_ct-sem-test-2020_acquisition-

২০১৬ সালে **Southerth University of California*** এর **Brain and Creativity Institute** এর মাধ্যমে জানা যায়, শিশুকালে সংগীত মস্তিষ্ক উন্নয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বিশেষভাবে ভাষাগত দিক থেকে এর ব্যবহার সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। আবার **National Association of Music Marchants Foundation (NAMM Foundation)*** এর জরিপ অনুসারে বলা যায়, যেকোন যন্ত্রসংগীতের সাথে সুরের খেলা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে গাণিতিক যুক্তির সদৃশ হিসেবে মনে করা হয়।

সংগীত শুধুমাত্র শিক্ষাগত দিক থেকেই শিশুদের মানসিক উন্নয়ন ঘটায় না। সংগীত একটি শিশুকে মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন করতেও সাহায্য করে। যেমন-সঠিকভাবে পড়াশোনা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, ভাষাগত শুদ্ধি সবকিছুর ক্ষেত্রেই সংগীত ভূমিকা রাখে। সংগীতের সাথে সাথে নৃত্য প্রদর্শনও একটি শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জরুরি। যা তাদের স্ব-অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সংগীতের মাধ্যমে যেকোন বয়সী শিশুরাই তাদের অন্তর্ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারে। যেমন-একটি নবজাতক যখন কোন সুর শোনে তখন সেই সুরের সাথে তার হাত পা ছোড়াছুড়ি করে এবং তার ভেতরকার অনুভূতি প্রকাশ করে। প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অনেক সময় যেকোন সুরে কথা বসিয়ে একটি গান তৈরি করে যা একটি শিশুর উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক। আবার এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষারত কোন শিক্ষার্থী যে কোন যন্ত্রসংগীত বাজানোর মাধ্যমে যেকোন গানের সমবেত উপস্থাপনা করে থাকে। এতে শিশুদের দলগত ভাবনার প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সুর দিয়ে গান রচনা বা কথায় সুর বসিয়ে গান রচনাও তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। একাধিক সমীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের সংগীতপ্রীতির কথা জানা যায়। সেক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী এই বিভাজন করা হয়। জানা যায়, নবজাতক শিশুরা শব্দ শেখার আগেই সুর শেখে। বিশেষ করে ঘুমের সময় একটি শান্ত ও করুণ সুর শিশুর চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয়। অন্যদিকে উচ্চ ও কর্কশ সুর শিশুর উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সম্ভব হলে গোসল করানো, খাওয়ানো বা ঘুমানোর সময় গানের দু এক লাইন গুনগুন করলে শিশু স্থিরচিত্ত যে কোন দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

আবার দেখা যায়, মোটামুটি আড়াই বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে যদি পুনরাবৃত্তিমূলক কোন গান উপস্থাপন করা যায় তাহলে তারা বেশ অনুপ্রাণিত হয় এবং সাথে সাথে স্মৃতিশক্তি ও প্রখর হয়। আবার যে কোন পরিচিত গানে অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করলে তাতে তারা বেশ আনন্দ পায় এবং ভুল শব্দ প্রয়োগের বিষয় বুঝতে পেরে আনন্দিত হয়ে শুদ্ধ করে গাওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে তাদের মানসিক উদ্ভাবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

***University of southerth California:** subscriber_google_____&gclid=EAIaIQob
https://dornsife.usc.edu/bci/
***NAMM Foundation:** https://www.nammfoundation.org/

তিন থেকে চার বছর বয়সী শিশুরা বিভিন্ন বানান শিক্ষা, গণনা ও বিভিন্ন তথ্য পুনরুদ্ধার এর ক্ষেত্রেও সংগীতের সাহায্য নেয়। এ সকল জিনিসগুলো যদি সুরের সাথে সাথে করা হয় তাহলে শিশু মস্তিষ্কে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিশুর মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সংগীত এমন একটি দেবদূতের ভূমিকা পালন করছে যা জন্ম থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশুর জন্ম থেকেই সংগীতের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ স্থাপন করে। কারণ এই সময় শিশু সহজে সংগীতের সুরের সাথে বাহ্যিক অনুভূতির মেলবন্ধন করতে পারে। মস্তিষ্কের উন্নয়নের জন্য শান্ত এবং কোমল সুরে দু এক লাইনের ছোট ছোট ছড়াগান সর্বপ্রথম শিশুদের সংগীতের সাথে পরিচিত করে। তাছাড়া তখন থেকেই শিশু নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং ধীরে ধীরে যখন সে কথা বলতে শেখে সুরের সাথে কথার মিশ্রণ হয়ে তা মনোজগতে বেশ প্রভাব ফেলে।

সংগীত শুধু শিশুর চিন্তা চেতনায়ই নয় বাড়ন্ত বয়সে তার মেধার স্থিরতা ও এনে দেয়। সংগীতের মাধ্যমে যেমন কথা বলা শিখে, তেমন সংগীতের মাধ্যমেই বাচ্চারা সামাজিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে অবগত হতে পারে। দলগত পরিবেশনা, সহযোগিতা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি সাংগীতিক সৌকর্য্যেরই পরিচায়ক। মারিয়া মন্তেসেরীর *"দ্যা অ্যাবজারবেন্ট মাইন্ড"* নামক অনুবাদ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> *"শিশু মন যা করতে পারে বা করে আমাদের মন স্বভাবত তা করতে সমর্থ নয়। শূণ্য থেকে একটি বিশেষ ভাষার বিকাশ ঘটাতে হলে এক ধরনের বিশেষ মানসিকতা দরকার। শিশুর তা আছে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা আমাদের বুদ্ধিমত্তার মত নয়।"*[১২]

আমরা বিভিন্ন ক্ষমতার প্রয়োগ করে জ্ঞান অর্জন করি কিন্তু শিশুরা তাদের আত্মিক জীবন দিয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। শিশুরা তার নিজস্ব অঙ্গনে যা দেখে তার মাধ্যমেই নিজের মস্তিষ্কের পেশিসমূহ তৈরী করে।

২.২ শিশুতোষ সংগীত রচয়িতা

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ শিশুকাল থেকেই তার মানসিকতাকে একটি নিদিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করে নেয়। আর এমন মানসিকতা নির্ভর করে শিশু অবস্থায় তৈরি হওয়া তার মানসিক প্রবৃত্তিগুলোর উপর। মানুষের এসকল সুকুমার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে সংগীতের কোন বিকল্প মেলা ভার। কেননা এই ললিতকলার মধ্যে সংগীতই একমাত্র সূক্ষ্ম মাধ্যম। যা মানবতন্ত্রীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং যা অন্য কোন প্রকাশ

[১২] মারিয়া মন্তেসেরী, *দি অ্যাবজারবেন্ট মাইন্ড*, *অনুবাদঃ অসিতবরন ঘোষ*, নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-১১

লীলায় সম্ভব নয়। তবে শিশুদের বয়সানুসারে তাদের মনে এ সকল সংগীতের অনুধাবনশক্তি ও সামর্থ্য বোঝার সক্ষমতাও আরেকটি মূল বিষয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশে যে শিশুতোষ সংগীতসমূহ প্রচলিত আছে সেগুলোর রচয়িতাদেরও যথেষ্ট সতর্কতাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করা দরকার। আর এ সকল রচয়িতা সংগীতের মাধমে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা যায়। এমন অনেক গুণিজন আমাদের দেশে আছেন যারা সকলেই যার যার অবস্থান থেকে কাল্পনিক, বৈষয়িক, প্রাকৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি উৎসসমূহ নিয়ে গান রচনা করেছেন। এসকল গান শিশুর সুকুমার প্রবৃত্তিকে আরও প্রখর করে তোলে। এবার সেই সকল গুণি রচয়িতা ও তাদের কতিপয় রচনার নাম তুলে ধরা হল-

- "সত্যজিত রায়-
  - আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে,
  - মহারাজা তোমারে সেলাম,
  - গুপ্তি বাঘা ফিরে এলো
- সলিল চৌধুরী
  - তাতা থেই তা থেই তা থেই,
  - বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে,
  - আয়রে ছুটে আয় পূজোর গন্ধ এসেছে
- কাজী নজরুল ইসলাম
  - ভোর হল দোর খোল,
  - প্রজাপতি প্রজাপতি,
  - শুকনো পাতার নুপুর পায়ে,
  - মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে।
- গৌরী প্রসন্ন মজুমদার- লাল ঝুটি কাকাতুয়া
- সুকুমার বড়ুয়া- রেলগাড়ি রেলগাড়ি
- জীবনানন্দ দাস- তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও
- জেব-উন-নেছা জামাল- মুক্তো মালার ছাতি মাথায়
- শামসুর রাহমান- আজব দেশের ধন্য রাজা
- এ.এফ.এম আলীমুজ্জামান- আমি যে ভাই যাদুওয়ালা
- কুসুমকুমারী দাস- আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
- ড. আশরাফ সিদ্দিকী- আজ শরতের হালকা হাওয়ায়

- আহসান হাবিব- আমি মেঘনা পাড়ের ছেলে
- পল্লীকবি জসিমউদ্দীন- ও আমার সোনার ক্ষেতের ধান
- খান আতাউর রহমান- ক-এ কলা, খ-এ খাই
- মোঃ রফিকুউজ্জামান- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত
- আবদুল হাই আল হাদী- ঘুম পাড়ানী ঘুমের পরী আয়রে আয়
- আলোক বসু- জল্‌সা হবে আজকে না কি ভালুক ভায়ার বাড়ি প্রভৃতি।

এসব রচয়িতারা শুধুমাত্র যে শিশুতোষ সংগীত রচনা করতেন এমন নয়। তাঁরা সব ধরনের সংগীতই রচনা করেছেন। তবে বিশেষ করে এ ধরণের সংগীত প্রথমে কবিতা আকারে এবং পরবর্তীকালে সংগীত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এমন অনেক রচয়িতাই আছেন যারা প্রথমে গীতিকার ছিলেন না, তাঁদের আত্মপ্রকাশ প্রথমে হয়েছে কবি হিসেবেই। পরবর্তী সময়ে এ সকল কথায় সুর বসিয়ে দেয়া হয় অন্য মাত্রা । যা সংগীত হিসেবেই বেশি সমাদৃত। কিছু কবিতা যেমন-ভোর হল দোর খোল, রেলগাড়ি রেলগাড়ি, তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে-প্রভৃতি গানসমূহ প্রথমে পাঠ্যপুস্তকে বা শিশুকিশোরদের উপযোগী পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এমন কিছু কিছু কবিতায় কবি নিজে বা অন্য কাউকে দিয়ে সুর বসিয়ে গানে রূপ দেন। যা কালের পরিক্রমায় শিশুতোষ সংগীত হিসেবেই বেশি সমাদৃত। 'শিশুতোষ সংগীত রচয়িতা' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ধারাকে বোঝায় সেদিক থেকে বিচার করলে এসব রচয়িতারা মোটেই একপাক্ষিকভাবে শিশুতোষ সংগীত রচয়িতা ছিলেন না। তারা বেশিরভাগই অন্যান্য সংগীতও রচনা করতেন, পাশাপাশি এসকল শিশুসুলভ গানও লিখেছেন। এখনও অনেক গান আছে যা আমরা কবিতা বা ছড়ার আকারে পড়ি। তবে যদি কখনও প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এর সুর ব্যবহার করে থাকি। যেমন-কুসুমকুমারী দাস এর লেখা "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে" এখানে কবিতা আকারেই দেখা হয়। তবে অনেক সময় শিশুকে এর অর্থ বোঝানোর জন্য বা তাদের সহজে বোধ্যগম্য করানোর সুবিধার্থে এতে সুর বসানো হয়ে থাকে।

২.৩ শিশুতোষ সংগীতে পঞ্চকবির অবদান

শিশুদের কোমলমতি মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণত এ ধারার সংগীত লেখা হয়। শিশুতোষ সংগীত লেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। তবে আমাদের সাংগীতিক জগতের পাঁচ কর্ণধারের রচনায়ও এ ধারার সংগীত লক্ষ্য করা যায়। যার সুরে তালে হয়তো শিশুসুলভ লক্ষণ পাওয়া যায় এবং শিশুরাও খুব সহজে তা আয়ত্ব করতে পারে।

সংগীতজগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জল নক্ষত্র। তাঁরা বিশেষ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে গান লিখেছেন এমন নয়। আবার একেবারে যে লেখেননি তা ও নয়। তবে তাঁদের কিছু কবিতা আছে যাতে সুর বসিয়ে শিশুদের চর্চার উপযোগী করা হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান হল-

- মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
- আজ খানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
- ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে
- পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
- আমরা সবাই রাজা
- ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়
- তোরা যে যা বলিস ভাই
- ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
- ওগো নদী আপনবেগে
- আলো আমার আলো ওগো
- স্বপন পাড়ের ডাক শুনেছি

প্রভৃতি গানসমূহে এমনভাবে সুর প্রণয়ন করা হয়েছে যেন মনে হয় শিশুদের গায়ন উপযুক্ত সংগীত। কিন্তু এসকল গান একপাক্ষিকভাবে শিশুতোষ নয়। তবে বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী এসকল গানের উপস্থাপনা শিশুদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উচ্ছলপূর্ণ মনে হয়। তাই শিশুদের জন্য এই গান আয়ত্ব করা খুবই সহজসাধ্য। অন্যদিকে, আরো দুজন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের গানের কথা ও সুরে শিশুতোষ সংগীতের উল্লেখ মেলে। সেখানে হয়ত একদম শিশুসুলভ ভাব প্রকাশ না করলেও সুরের দিক থেকে এমন একটি ধারা আছে যেন খুব সহজেই শিশুরা গাইতে পারে-যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গান

"বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসী তরী
সঙ্গে কে কে যাবি আয়।"

II	া - া সা	I	রা মা পা	I	পধা পধা ধা	I	-া-া-া	I
	০ ০ বে		লা ব য়ে		যা ০ ০০ য		০ ০ ০	
I	ণঃ ধা ধা	I	ধর্সা র্সনর্সর্সা- পা	I	পা পা ণা	I	পদা ধনধা স্মা	I
	ছো ট্ ট		মো০ দে০০০ র		পা ন সী		ত০ রী০০ ০	

I	মা মা মা	I	মগা রা গা	I	গমা -ধা পা	I	পমা-া মা	II[১৩]
	স ং গে		কে০ ০ কে		যা০ ০ বি		আ০ ০ য়	

স্বরলিপিগতভাবেই বোঝা যায় গানটির কথা যতটা সহজবোধ্য এবং সহজে উচ্চারণযোগ্য তেমনি সুরটাও বেশ ছন্দবদ্ধ ও চটুল। গানটির বাকি কথাগুলোও একই ধারায় ধাবিত হচ্ছে। যেমন-

"দোলে হার বকুল যুঁথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর, মধুর বাতাসে।
হেলছে তরী দুলছে তরী ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়"

কবি রজনীকান্ত সেনও কিন্তু তাঁর স্বকীয় ধারা বজায় রেখে শিশুদের উপযোগী গান রচনা করেছেন। একটি গান উদাহরণসহ দেয়া যেতে পারে-

"অনন্ত দিগন্ত ব্যপী অনন্ত মহিমা তব
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে অনন্ত তোমারি স্তব।।"

স্বরলিপিগত দিক দেখলে হয়ত কিছুটা আঁচ করা যাবে--

II	-া-া জ্ঞ রা	I	সা বাধা -া ণা	I	সা সা মা -া	I	-া মা মা- া	I
	০০ অ ন		ন্ ত০ ০দি		গ ন্ ত ০		০ ব্যাপী ০	
I	-া-া মা ধা	I	ধা র্সণ -া ধা	I	না -া জ্ঞা মা	I	জ্ঞা রা সা -া	II[১৪]
	০ ০ অ ন		ন্ ত ০ ম		হি ০ ম		০ ত ব ০	

রজনীকান্ত সেনের এমন গানের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে তার রচনা শুধু বিশিষ্ট সংগীত বোদ্ধারাই নন, শিশুদের অন্তরের নাগালও পেয়েছে।

এরপর আসেন অতুলপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর সংগীত জীবনে খুব বেশি বিস্তৃতি লাভ না করলেও তাঁর স্বল্প সংখ্যক রচনার মধ্যে শিশুদের বোধগোম্য সুর ও তালের গান রয়েছে বেশ কিছু। যেমন-

১. ওগো আমার নবীন সাথী
২. যাব না যাব না যাব না ঘরে
৩. আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন সাহসে? প্রভৃতি

এখানে এই গানের স্বরলিপি বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায়-

---

[১৩] শঙ্কর রায়, *ছোটদের গান শেখা*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ২০১০, পৃষ্ঠা ২৬৬
[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭১

II	সা -সরজ্ঞা া ও গো০০ ০	I	-জ্ঞরা সন্া ল্ন ০০ আ০ মার	I	ন্সা নসা রজ্ঞ ন বী০ ০ন	I	রা র০০রজ্ঞা সা থী০০ ০	I	
I	সা -া সা ০ ০ ছি	I	রা মা মা লে তু মি	I	রগা গা মগা কো ন বি০	I	রা সা -া না নে ০	I	
I	-া -া -া ০ ০ ০	I	-া সা নন্া ০ অ মার	I	সা গা গা স ক ল	I	গা গা -মা হি য়া ০	I	
I	মা মা মাগরা মু ন্ ভা০০	I	রা রা -গমা রি ছে ০০	I	-রগা -া -া ০০ ০ ০	I	-র সা ন্না র আ মার্	I	
I	রা রা -া তো মা ০	I	র্পা মা মা রি ও ই	I	গা র্গা ম্গা ক রু ন্	I	র্সা সা -া গা নে ০	II[১৫]	

এসকল রচনার মাধ্যমে বোঝা যায়, কবিরা শুধু লেখনীর জন্য লেখেন নি। তাঁরা সব শ্রেণির প্রয়োজনেই সংগীত রচনা করেছেন।

এদিকে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর রচনায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে কিছু গানের সুর করেছেন যা শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের জন্য প্রযোজ্য। তবে তাঁর কিছু কিছু গানের সুর এমন যে সব বয়সীদের জন্য হলেও শুধুমাত্র শিশুদের আত্মস্থ করার সুবিধার্থে এই গানগুলো বেছে নেয়া হয়। নজরুলের কিছু গানের সুরের ধারার জন্য গানের উপস্থাপনকারিও বদলে যায়। তাঁর কিছু গান ইরানী সুরে, কিছু গান পাহাড়ী সুরে, কিছু গান লোকসুরের আদলেও দেখা যায়। নজরুলসৃষ্ট শিশুদের গানের মধ্যে যে সকল গান অধিক প্রচলিত তা হল-

- শুকনো পাতার নুপুর পায়ে
- প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা
- চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়
- তোমার বীণা তারের গীতি
- একাদশীর চাঁদ রে ঐ রাঙ্গা মেঘের পাশে
- আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ
- মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে

এছাড়া আরও অনেক গান আছে যা নির্দিষ্টভাবে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত না হলেও সুর ও কথার গাঠণিক আকারের জন্য একে শিশুসুলভ মনে হয়। এমন একটি গানের স্বরলিপি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে-

[১৫] তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫

"চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়

পল্লীর বালিকা বনপথে যায় একেলা বনপথে যায়।।"

II	{পা -া সা া	I	পা -া সা -া	I	পা ক্ষা পা ধা	I	প্মা- া-া- া	I
	চম্ ০ কে ০		চম্ ০ কে ০		ধী রু ভী রু		পা ০০ য়	
I	মা -া মগা রা	I	গা গা গরা -সা	I	সা সা রা গা	I	[র]সা পরা [স]পা	I
	প ল্ লী০ ০		বা লি কা০ ০		ব ন পথে		যায় একে লা	
I	সা সা রা গা	I	[র]সা -া -া -া	II[১৬]				
	ব ন প থে		যা ০০ য়					

এ গানের গঠণগত দিক দেখলে বোঝা যায় সুর, তাল ও কথা একটি শিশুর আয়ত্বে আনার জন্য কতটা সহজ ব্যপার! শিশুরা তাই সাবলীলভাবে এই গানগুলো উপস্থাপন করতে পারে।

২.৪ শিশুতোষ সংগীতের কথাও সুর

শিশুদের সংগীতের জন্য যে কথা বা সুর তা নির্ভর করে শিশুর বয়সের উপর। শিশুদের বয়সের সাথে সাথে মানসিক যে বিকাশ হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই কথা ও সুর নির্মাণ করা হয়। সাধারণত একটু দ্রুত তালে চটুল প্রকৃতির সুরে শিশুতোষ সংগীত রচনা করা হয়। আবার কথার সাথে ছন্দের গাঁথুনিরও সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। তা না হলে শিশুরা সংগীতে অনীহা প্রকাশ করে। গানের কথার প্রতিটি লাইনের সাথে একটু চটুল ছন্দ থাকলে শিশুদের জন্য উচ্চারণ ও গায়ন সহজসাধ্য হয়। এমন কয়েকটি গানের উদাহরণ দেয়া হল-

১. টাট্টু ঘোড়া পারলো ডিম

শেয়াল দিল তা

দুদিন পরে বের হলো এক

কানাবগীর ছা

বা বা বা   বা বা বা।।[১৭]

২. আজব দেশের ধন্য রাজা

দেশ জোড়া তার নাম

বসলে বলেন হাট্‌রে তোরা

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা-২৩১

[১৭] https://www.facebook.com/tattughola/posts/593343434035579/

চললে বলেন থাম

থাম্ থাম্ থাম্।।[১৮]

৩. ক-এ কলা, খ-এ খাই এত বেশী খেতে নাই

গ-এ গরু ঘ-এ ঘাস কত খাস খেতে চায়

ঙ-বলে কোলা ব্যাঙ সারা দিন ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ

ক খ গ ঘ ঙ।।[১৯]

শিশুতোষ সংগীতের কথাগুলো সাধারণত রূপকথা বা অলীক বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরি হয়। যাতে শিশুরা তাদের কল্পনার পরিসরকে আরও বিস্তৃত করতে পারে। তাছাড়া শিশুদের ধারণক্ষম সুরই এসকল কথায় বসিয়ে উপস্থাপন করা হয়। যেমন-উপরে উল্লিখিত গানগুলোর কথা লাইন অনুসারে ছন্দোবদ্ধ এবং বিষয়বস্তুও বেশ চমকপ্রদ। তাই শিশুরা আগ্রহের সাথে এসকল গান শোনে এবং সাথে সাথে গেয়েও থাকে। যদিও এসব গান প্রচলিত সুরে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। তাই অনেক গানের রচয়িতা বা সুরকারের আসল নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিশুতোষ গানের সবচেয়ে বেশি শ্রোতা হল শিশুরা। তাই এ বিষয় মনে রেখে শিশুতোষ সংগীতগুলোর এমন কিছু কথা লিপিবদ্ধ করতে হয়, যার মাধ্যমে শিশুর ভাষাও সুশৃংখল ও মার্জিত হয়। এসকল গানের মাধ্যমে শিশু নতুন নতুন শব্দ শিখে থাকে এবং আরও নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী হয়। তাই শিশুতোষ গানগুলোর কথা ও সুরের সামঞ্জস্যপূর্ণ রচনা একান্ত কাম্য।

২.৫ প্রচলিত শিশুতোষ সংগীত

বিভিন্ন রচয়িতাদের হাজার হাজার শিশুতোষ সংগীত রয়েছে তবে সব গানই জনপ্রিয়তা পায় নি। শিশু জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন ধরণের শিশুতোষ গানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অভ্যস্ততার প্রথম ধাপ আসে পরিবার থেকে। তখন পরিবারের সদস্যরা শিশুকে কোলে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গান শোনায়। তাছাড়া শিশু যখন একটু বুঝতে শেখে তখন তাকে ছড়া গানের পাশাপাশি অন্যান্য গানও শোনানো হয়। এতে শিশু আনন্দ পায় এবং তাদের উদ্দামতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। শিশুদের গ্রহণযোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী এমন কিছু শিশুতোষ সংগীতের পূর্ণরূপ তুলে ধরা হল-

[১৮] দেবপ্রসাদ দাঁ, ছোটদের ছড়াগান ও স্বরলিপি, মেরিট ফেয়ার, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৬৩

[১৯] https://hifimov.cc/videos/10/0SzyVym9kIY/%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%96-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87/%E0%A6%95-%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%96-%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87-ko-e-kola-ferdausi-rahman-kids-song-bangla-karaoke-with-bangla-rolling-lyric

১

রচয়িতাঃ কাজী নজরুল ইসলাম

তালঃ কাহারবা

আরবী সুর

শুকনো পাতার নুপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়,
জল-তরঙ্গে ঝিলমিল্
ঢেউ তুলে সে যায়।।
দীঘির বুকে শতদল দলি
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি
চঞ্চল ঝরণার জল ছলছলি
মাঠের পথে সে ধায়।।
বনফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি ধূসর কায়।।
ইরানী বালিকা যেন মরুচারিণী
পল্লীর প্রান্তর বন মনোহারিনী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক বরণী
বালুকার উড়নী গায়।।[২০]

[২০] শঙ্কর রায়, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪১

২

রচয়িতাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালঃ ঝুমুর

ওগো নদী আপনবেগে পাগলপারা
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফুলের ধারা।।
ওগো নদী চলার বেগে পাগলপারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপনহারা-
আমার চলা যায়না বলা-
আলোর পানে প্রাণের চলা
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা।।[২১]

৩

রচয়িতাঃ শামসুর রহমান

সুরঃ এ.এফ.এম. আলীমউজ্জামান

তালঃ ঝুমুর

আজব দেশের ধন্য রাজা
দেশ জোড়া তার নাম
বসলে বলেন হাটরে তোরা
চললে বলেন থাম
থাম থাম থাম(২)।।

[২১] তদেব, পৃষ্ঠা-১৭১

রাজ্যে ছিল শাস্ত্রী সেপাই

মন্ত্রী কয়েক জোড়া

হাতিশালে হাতি ছিল

ঘোড়াশালে ঘোড়া।।

গাছের ডালে শুকসারিদের

গল্প ছিল কত!

গল্পে তাদের রাজার কথা

ফুটতো খইয়ের মত।

এই না বলে স্বপ্নে রাজা

দেখেন সোনার ঘড়া

প্রজায় দেখে রাজার মুকুট

কাগজ দিয়ে গড়া।।[২২]

৪

রচয়িতা ও সুরকারঃ সত্যজিৎ রায়

তালঃ কাহারবা

আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে

শাঁখে শাঁখে পাখি ডাকে

কত শোভা চারিপাশে ।।

আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন

আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা

হয়েছি স্বাধীন আহা হয়েছি স্বাধীন

আজ আবার মোরা ভবগুরে

মুলুক ছেড়ে যাব দূরে

ভরবো ভূবন গানের সুরে পুরানো দিনের কথা আসে

মনে আসে ফিরে আসে।।[২৩]

---

[২২] শঙ্কর রায়, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪১

[২৩] দেবপ্রসাদ দাঁ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯

৫

রচয়িতাঃ কুসুম কুমারী দাস

সুরঃ সেলিম রেজা

তালঃ দ্রুত দাদ্‌রা

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে
সেই ছেলে কবে.....।
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন
মানুষ হইতে হবে এই যার পণ
সেই ছেলে কবে.....।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান
নাইকি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ
হাত পা সবারই আছে মিছে কেন ভয়
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়
সেই ছেলে কবে.....।
সেই ছেলে কে চায় বলো কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায়
সদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ
'মানুষ' হইতে হবে মানুষ যখন
সেই ছেলে কবে.....।[২৪]

[২৪] https://jyotirjagat.wordpress.com/

৬

রচয়িতাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তালঃ কাহারবা

লাল ঝুটি কাকাতুয়া

করেছে যে বায়না

চাই তার লাল ফিতে চিরুনী আর আয়না।।

জেদ বড় লাল পেড়ে

টিয়ে রং শাড়ি চাই

মন ভরা রাগ নিয়ে

হলো মন ভারী তাই

বাটা ভরা পান দিলেম মান কেন যায়না।।

ছোট থেকে কোনদিন বড় যদি হতে চাও

মন দিয়ে ভাল করে

লেখাপড়া শিখে নাও

দুষ্টুমি করে যে কেউ তারে চায় না।।[২৫]

৭

রচয়িতা ও সুরকার : সলিল চৌধুরী

তালঃ দাদরা

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে

আয় না যা না গান শুনিয়ে

দূর দূর বনের গান নীল নীল নদীর গান

দুধ ভাত দেবো সন্দেশ মাখিয়ে।।

ঝিলমিল ঝিলমিল ঝর্ণা যেথায়

[২৫] দেবপ্রসাদ দাঁ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৮

কুলকুল রোজ বয়ে যায়

ব্যঙ্গমা ব্যাঙ্গমী গল্প শোনায়

রাজার কুমার পক্ষীরাজ চড়ে যায়

ভোরবেলা পাখনা মেলে দিয়ে তোরা

এলি কি বল না সেই দেশ বেড়িয়ে।।

কোন গাছে কোথায় বাসা তোদের

ছোট্ট কি বাচ্চা আছে তোদের

দিবি কি আমায় দুটো তাদের

আদর করে আমি পুষবো তাদের

সোনার খাঁচায় রেখে ফল দেবো খেতে

রাধে কৃষ্ণ গান দেবো শিখিয়ে।।[২৬]

৮

রচয়িতা ও সুরকারঃ এ.এফ.এম. আলীমউজ্জামান

তালঃ কাহারবা

ঝিকঝিক ঝিক ঝিক ঝিকঝিক ঝিক ঝিক

চলে রেলগাড়ি

এতে চড়ে আমি এবার পৌঁছে যাব বাড়ি।।

রেলগাড়ি রেলগাড়ি চলে এঁকেবেঁকে

বাঁশি বাজায় জোড়ে জোড়ে

একটু থেকে থেকে

নিয়ে যাব সঙ্গে করে মিষ্টি যে সাত হাঁড়ি।।

সবাই মিলে মজা করে মামার বাড়ি যাবো

সেথায় গিয়ে চানাচুর আর টক ঝাল আচার খাবো

রাগারাগি করলে সবাই নিয়ে নেবো আঁড়ি।।[২৭]

[২৬] তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৬

[২৭] তদেব, পৃষ্ঠা-১১৮

৯

রচয়িতাঃ আবদুল হাই আল হাদী

সুরঃ এ.এফ এম. আলীম উজ্জামান

তালঃ ঝুমুর

টুকটুকে লাল রাঙা পুতুল বউ সেজেছে আজ
বিয়ে বাড়ি ব্যাস্ত সবাই নিয়ে নানান কাজ।।
কাঠবিড়ালী বরের মাসি বসেছে মাঝখানে
তাক্‌ধিনাধিন ছড়া কেটে আসর জমায় গানে
তানপুরাতে তান ধরেছে ইঁদুর মহারাজ।।
পাড়া পড়শি এলো কত ময়না টিয়ার দল
ভোজন শেষে সবাইতারা করছে কোলাহল
ছেলে মেয়ে হল্লা করে পরে নতুন সাজ।।[২৮]

১০

রচয়িতাঃ অলোক বসু

সুরকারঃ জয়ীতা বসু

তালঃ কাহারবা

পুতুল সোনা রাগ করে না
মুখ করে না ভার
আমি তোমায় এনে দেব গজমতির হার।।
ফোকলা দাঁতে একটু হাসো
এবার দেখি তুমি
রসের হাঁড়ি এনে দেবো
সোনা যাদু মনি
আরও তোমায় এনে দেবো

[২৮] তদেব, পৃষ্ঠা-১২১

দামী উপহার।।

কোলে এসো খেতে এসো

আর কেঁদো না তুমি

পরীর দেশে নিযে যাব

লক্ষ্মী সোনা মনি

আরও তোমায় এনে দেবো

দামী উপহার।।[২৯]

বিভিন্ন ধারার এসকল গান শুনে শিশু যেমন আনন্দ পায়, তেমনি পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও অবগত হয়। শিশুর মনের এসব অনুভূতি দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় অনুধাবন করতে পারে। শিশুমনের এই সাবলীল ভাবভঙ্গি শিশুকে কৌতুহলী করে তোলে। জানার আগ্রহ ও পরিধি বৃদ্ধি করে। জীবনে ছন্দ এনে দেয়। মূলতঃ শিশুদের মন কাদামাটির মত নরম। আবার কল্পনাবিলাসীও। কল্পনার রাজ্যকে সঙ্গী করে পরীস্থানের পরীদের সঙ্গেও ওড়াউড়ি করবে। আবার গলা ছেড়ে গানও করবে। কখনও ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো প্রজাপতিও হবে। এরকম বিভিন্ন ভাবনার উদয় হবে শিশুমনে। এভাবই শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণধারার জ্ঞানে আচ্ছাদিত হবে।

[২৯] তদেব, পৃষ্ঠা-১৪২

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত

শিশুমন স্বভাবতই কোমল। শিশুদের যেমন শারিরীক যত্নের প্রয়োজন আছে তেমনি মানসিক যত্নের প্রয়োজন ও আছে। শিশুর মানসিক যত্নের বেশ কতগুলো উপাদান বা মাধ্যম দেখা যায়। যেমন: ছড়া, কবিতা, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি। এসকল মাধ্যমই সমানভাবে উপযুক্ত। তারপরেও সংগীত এমন একটি মাধ্যম যা অবচেতন মনেই মানুষ প্রকাশ করে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই মাধ্যম আরও সহজাত। কেননা, শিশুরা জন্মের পর থেকেই সুরের সাথে পরিচিত হয়। সুর শিশুর কানে এক প্রশান্তির আবাহন দেয়। আর এভাবেই সময়ের সাথে সাথে শিশুরা সংগীতের সাথে নিজেদের মনের ভাব ব্যাক্ত করতে পারে। একটি নবজাতক শিশুকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সংগীত বা সুরের সাথে তার চঞ্চলতা খুব দ্রুততার সাথে প্রকাশ করে। লক্ষ্য করলে আরও দেখা যায়, শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বিভিন্ন সংগীতের মাধ্যমে তার কর্মোদ্যমও প্রকাশ করে। এসব শিশু যখন বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে প্রবেশ করে তখন তাদের মানসিক বিকাশের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। নতুন পরিবেশ, নতুন ধারার শিক্ষা, নতুন বন্ধু সব মিলিয়ে তাদের মানসিকতা প্রশমনের এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এ বয়স থেকেই। তাই প্রাথমিক জীবনে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে বিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষাকে আজ বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছে। বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন গানের সংযোজন শিশুর মানবীয় গুণাবলিকে আরও উন্নত করছে। সামাজিকতা, নৈতিকতা, জাতীয়তাবোধে আরও উদ্বুদ্ধ করছে। যা শিশুর ভবিষ্যত জীবন চলার পথে নিজেকে উন্নত মানুষ হিসেবে পরিচয় দানে সচেষ্ট করবে।

৩.১ শিশুতোষ সংগীত ও শিক্ষা

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সংগীত ও মানবজীবন একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সহযাত্রিরূপে মানব মনের বিকাশ সাধন করেছে এই সংগীত। হৃদপিণ্ড যেমন মানুষের বেঁচে থাকার যন্ত্র, সংগীতও তেমনি পার্থিব জগতে বেঁচে থাকার মন্ত্র। সংগীতের স্বাদ পার্থিব জগতেও অপার্থিব জগতের সন্ধান দেয়। এজন্য পৃথিবীতে যত প্রকার বিদ্যার্জনের ধারা রয়েছে তার মধ্যে সংগীতবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এই বিদ্যার্জনের সময়কাল শুরু হয় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুকাল পর থেকেই। জন্মের পর থেকে মোটামুটি দশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ই শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা করা হয়, এই বয়সেই শিশুদের মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভা বিকশিত হয়। শিশুর ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান করলে তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। শিশুর শিক্ষাজীবন হওয়া উচিৎ আনন্দপূর্ণ। আনন্দ ও শিশুবান্ধব পরিবেশ ছাড়া তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ প্রায় অসম্ভব। আর শিশুর আনন্দের খোরাক হিসেবে যোগান দিতে পারে নানাবিধ শিশুতোষ গান, শিশুতোষ ছড়া কিংবা কবিতা। বর্তমানে বর্হিবিশ্বে সংগীতচর্চার বিশেষ প্রসার ঘটলেও আমাদের দেশে শিশুতোষ সংগীতের তেমন স্বনির্ভর ও উপযুক্ত মাধ্যমের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শিশুসাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার তুলনায় ছড়া গান বা শিশুতোষ গান খুব

সংবেদনশীল এবং তাৎক্ষণিক অনুভূতিতে সাড়া জাগাতে সক্ষম। শিশুতোষ গানের মূল প্রাণ হচ্ছে অর্থহীন শব্দের ব্যঞ্জনা। যেসকল বিষয় শিশু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বুঝবে না বা আকার ইঙ্গিতেও বোঝানো সহজ নয় সে সকল বিষয় শিশু যাতে অনুপ্রাসের মাধ্যমে বুঝে নিতে পারে তার জন্যই শিশুসুলভ গান বা সুরের প্রয়োগ করা হয়।

একজন মানুষের সম্ভাব্য সকল গুণ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয় মানবশিশু। তবে অধিকাংশ গুণই সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে এই মানবশিশুর মধ্যে। শিশুর চেতনাবোধই এ সকল গুণের আশ্রয়স্থল। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দৈহিক অবয়বের ক্রমবিকাশের সাথেই মানবিক এসকল গুণাবলির বিকাশ আরম্ভ হয়। তাই বলা যায়, শিশুর মানসিক বিকাশের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা শিশুর মানসিক অবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটায়। এই শিক্ষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি মূলত পড়া ও লেখার প্রতি অধিক নির্ভরশীল। আরেকটু বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, যথার্থ অনুধাবনের মাধ্যমে পড়া ও লেখার ভিতর দিয়ে এই শিক্ষার প্রকাশ করা হয়। তবে প্রথমিক শিক্ষা যে একেবারেই পড়ালেখা দ্বারা শুরু হয় এমনটা নয়। একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। আর এই পুরো শিক্ষাজীবনের মধ্যে মানসিক বিকাশ হয় মোটামুটি দশ বছর বয়স পর্যন্ত। তবে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু শুধুমাত্র শ্রুতিনির্ভর পড়াশোনার উপর চলতে থাকে। তারপরে বয়সের সাথে সাথে শিশু তার সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে জীবনের সাথে এই শিক্ষার ধারা জড়িয়ে পড়ে।

সাধারণত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিচারে শিশুর তিন থেকে পাঁচ বছরকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা এবং পাঁচ থেকে দশ বছরকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। একটি শিশুর যতখানি মানসিক বিকাশ হয় তার অধিকাংশই এই সময়ে হয়ে থাকে। আর তাই জীবনের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধের যে গোড়াপত্তন তা এই সময় থেকেই শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে শিশুরা যেহেতু এই সময়ে অনুপ্রাসনির্ভর হয় তাই তাদেরকে সুরের দোলাচলে ভাসিয়ে রাখাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। শিক্ষার বিভিন্ন ধারা থাকা সত্ত্বেও প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের সাধারণত সাংগীতিক ধারার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ হয়ে থাকে। কেননা এই বয়সের শিশুরা সাধারণত সহজসাধ্য বিষয়ে অভ্যস্ত হতে চায়। আর সেদিক থেকে বিচার করলে সুর বা সংগীত যেকোন বিষয়কে সহজে আত্মস্থ করতে সহায়তা করে।

সংগীত একটি শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সম্পূর্ণরূপে জড়িত। সংগীতের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি শিশুর বেড়ে ওঠাই নয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিকতা, ভাষাগত পরিপাট্য সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রেও নিজেকে

প্রজ্বলিত করতে পারে। সাংগীতিক চর্চা শিশুর শরীর ও মনকে একসাথে পরিচালিত করতে পারে। তাছাড়া সংগীতের মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন ধ্বনি বা অর্থপূর্ণ শব্দের সাথে নিত্যদিন পরিচিত হতে পারে।

৩.২ শিক্ষায় শিশুতোষ সংগীতের গুরুত্ব

শিশুরা স্বভাবগতভাবেই সংগীতপ্রিয় হয়ে থাকে। আর সে সংগীত যদি হয় শান্ত ও কোমল সুরের তাহলে খুব সহজেই শিশুরা তাদের দৈহিক ও মানসিক মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়ে থাকে। প্রথম বয়সে নবজাতক শিশুরা তাদের দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সংগীতের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে। এরপরে তারা বিভিন্ন অর্থহীন শব্দের সাথে সুরযোজনার মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক যোগযোগ স্থাপন করে। অনেক সময় শিশুরা শাব্দিক কথা বলার আগে দৈহিকভাবে সাংগীতিক সুরকে গ্রহণ করে থাকে।

এরপরের স্তরের শিশুরা যখন একটু বুঝতে শেখে তখন তারা বিভিন্ন সংঘবদ্ধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগীতকে উপভোগ করতে শেখে। সংগীত মূলত মনের ভাবকে স্থির করে। শান্ত ও কোমল ছন্দের সুর শিশুর মানসিক বিকাশে স্থিরতা আনে। সেই সাথে শিশু উপযোগী সংগীতে যদি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আদর্শ মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সাংগীতিক শিক্ষা বা মানসিক বিকাশের সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে একটি শিশু ছোট থেকেই আচার-আচরণ, চলন, সামাজিকতা তথা মানবীয় গুনাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তবে এই শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক দিক নির্দেশনার উপর নির্ভর করে নয়, পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই এর প্রচার শুরু হতে পারে। এতে শিশুরা যে সকল বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন হতে পারে তা হল-

- সংঘবদ্ধ চিন্তার প্রসার
- সামাজিকতা জ্ঞান বৃদ্ধি
- আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ
- সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিজের অস্তিত্বকে তুলে ধরা
- দৈহিক চালচলনে পরিপাট্য
- চিন্তাশীল মানসিকতা তৈরি
- নতুন শব্দ সম্পর্কে ধারণা ও প্রয়োগ
- উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ ‘
- একসাথে বিভিন্ন কাজে ভারসাম্য আনয়ন প্রভৃতি।

জীবনের শুরুর দিকে উৎসাহ যোগানো ও শিক্ষাদান শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। কথা বলা, পড়াশুনা, গান গাওয়া, ধাঁধার সমাধান এবং অন্যদের সঙ্গে খেলাধুলা শিশুর মানসিকতার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। জানা যায়, মোটামুটি এক বছর বয়স থেকে দুই বছর বয়সকাল পর্যন্ত শিশু যেকোন কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, কথার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে, শব্দের অনুকরণ করে এবং অর্থবোধক শব্দ বলার চেষ্টা করে, বড়দের যেকোন কাজকর্ম অনুকরণ করে , নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, খেলাধুলা শুরু করে।

পরবর্তীকালে তিন থেকে পাঁচ বছরে শিশুরা নতুন নতুন বিষয় শেখে এবং উপভোগ করে, দ্রুত ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করে, যে কোন বিষয়ে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা অর্জন করে এবং নিজের মত করে কিছু করতে চায়।

এসকল দিক বিবেচনা করে দেখা যায়, সংগীতই একমাত্র মাধ্যম যা এই ধরণের সকল অবস্থার একত্রীকরণ করতে পারে। সংগীতের মাধ্যমে শিশু সামাজিক, শারিরীক, মানসিক সকল প্রকার জ্ঞান খুব দ্রুততার সাথে আহরণ করতে পারে। কেননা সুরের মাধ্যমে যে কোন শব্দ শিশুর মস্তিষ্কে খুব দ্রুত স্থান পায়। তাছাড়া শিশুর প্রাত্যহিক কাজের সাথেও সুর বা সংগীতের যোগসূত্র রয়েছে। সেটা শ্রেণিকক্ষে বা বাড়িতে যেখানেই হোক না কেন শিশু তার বুদ্ধিমত্তাকে যে কোনভাবে সংগীতের সাথে মিলিয়ে নিজস্ব সৃজনশীল চিন্তার পরিধি তৈরি করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের শিশুতোষ সংগীত শিশুকে বিভিন্ন নতুন শব্দ চিনতে বা তার প্রয়োগ ঘটাতে সাহায্য করে। সাথে সাথে তাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়াও প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষাগত ধারা অনুযায়ী শিশু সুরের সাথে সাথে গণনা শেখে, কোন ভাষার একটি শব্দ থেকে অন্য শব্দ উচ্চারণের পার্থক্য সম্পর্কে জানে, বিভিন্ন বস্তুকে সহজে চিনে তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে, বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী গান গাইতে পারে বা তাদের নিজের মত করে গান তৈরি করতে পারে। একটি শিশু স্বভাবতই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সুরের সংযোগের মাধ্যমে তাদের দৈহিক, মানসিক সকল ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। অতএব বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র সুর নয় একটি পরিপূর্ণ সংগীত শিশুর মানবীয় গুণাবলিকে আরো উন্নত করতে পারে।

৩.৩ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিক বিকাশে শিশুতোষ জ্ঞান ও পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রাত্যহিক জীবনে শিক্ষা আর সংস্কৃতি হলো মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত গুণাবলি সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করা হবে এটাই সামাজিকতার অংশ বলে ধরে নেয়া হয়। আর সেই সাথে সংগীতকে শিক্ষার একটি অংশ বলে মনে করা হয়। শিশুর জ্ঞান বিকাশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীতের অগ্রাধিকার সংস্কৃতিতে যে স্থান তৈরি করে দিয়েছে তা অতুলনীয়। তবে শিশু তার পারিবারিক পরিমণ্ডল

থেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে পারে। বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী একটি সদ্যোজাত শিশু থেকেই এই শিক্ষার ধারা শুরু করা যেতে পারে। এই সাংগীতিক জ্ঞান যে শিশু শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই পাবে এমনটা নয়। এই প্রাথমিক জ্ঞান শিশুরা মূলত মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থা থেকেই আহরণ শুরু করে। জন্ম থেকেই মা-বাবা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন সাংগীতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে মানসিক বিকাশে সহায়তা করে থাকে। নবজাতকরা বিভিন্ন সুরের সাথে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে নিশ্চিত করছে। তাছাড়া এই বয়সের শিশুরা নিত্যনতুন সুর খোঁজার চেষ্টায় নিবৃত্ত থাকে। আর এ সবকিছুই শিক্ষার এক একটি অংশ যা পরবর্তীকালে শিশুর মানসিকতাকে বৃহৎ করে একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসেবে তৈরি করে। এ সময়ে শিশুরা নিত্যনতুন জিনিসের সাথে পরিচিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখে সে বাজানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। যা ভবিষ্যত জীবনে সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলতে পারে।

এ সম্পর্কে আবুধাবির আমীর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি জনাব শেখ জায়েদ বলেছেন,

> *"Future generations will be living in a world that is very different from that to which we are accustomed. It is essential that we prepare ourselves and our children for that new world."*[৩০]

শেখ জায়েদ একটি দেশের প্রণেতা হয়েও ভবিষ্যত প্রজন্মের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। আমরা শুধুমাত্র শিশুকে আগামী দিনের জন্য তৈরি করি, তাও পাঠ্যবইয়ের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু এই ধারাকে সামান্য সৃজনশীল ও ব্যতিক্রম চিন্তা দিয়ে বদলাতে পারি। বর্তমান সময়ে স্বল্প প্রাধান্য দিয়ে হলেও একটি সার্বজনীন ভাষা হিসেবে সংগীত পুরো পৃথিবীর মানুষকে একাত্ম করে রেখেছে। তবে বর্তমানে কিছু গবেষক সংগীত শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে তাদের কণ্ঠ জোড়ালো করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন-**Carl Rogers*** এবং **Abraham Maslow***. এই দুইজন শিশুর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করতে সংগীতের ভূমিকাকে গুরুত্ববহ মনে করেছেন।
শিশুরা সেই জায়গাকেই নিরাপদ মনে করে যেখানে তাদের মানসিক স্বাধীনতা রয়েছে। যেখানে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার গুরুত্ব রয়েছে। এই স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয় তার জন্য শিশুদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, তাদের সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরণা দিতে হবে এবং তাদের উপযোগী বিভিন্ন বুদ্ধিদীপ্ত কাজে উৎসাহ দিতে

---

[৩০] Mohammad Al Mubarak, Music helps children expand their cultural horizon; The national; National association for music education, September 18, 2014 Music 'helps children expand their cultural horizons'-NafME.html

***Carl Rogers** https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers

***Abraham Maslow** https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow

হবে। আর এ সকল কাজের জন্য অন্যতম একটি মাধ্যম হল সংগীত। শিশুরা শুধুমাত্র সুরে বেসুরে গাইলেই হবে না, তাদের তালে তালে গান শেখানো যেতে পারে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম সম্পর্কে ধারণা দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলিও যেমনঃ phonic গুলোও সুরে ও তালে শেখালে দৃঢ়তার সাথে মনে রাখা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। শিশুরা তাদের সমাজের অসামঞ্জস্যতার সাথে অভ্যস্ত নয়। তাই তাদের সকল ধরণের জ্ঞান দানের জন্য, তাদের সৃজনশীলতার পরিধি বাড়ানোর জন্য, সামাজিকীকরণের জন্য মানসিক সক্ষমতার প্রয়োজন হয়। আর এসকল ক্ষেত্রে মানসিকতা প্রসারের জন্য কিছুটা হলেও সংগীত বা সৃজনশীল ভাবধারা সম্পর্কে শিশুকে অবগত করানো উচিৎ। মোটকথা, সংগীত ও সৃজনশীল ভাবধারা শিশুর জ্ঞান বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সংগীত তখনই একটি শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে যখন শিশুর বাবা-মা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবকরা তাকে সাংগীতিক বিষয়গুলোতে সৃজনশীলতা প্রকাশে সুযোগ করে দেয়। তবে সংগীত যে কেবল কণ্ঠনির্ভর হবে এমন নয়। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নিত্যনতুন বাদনকৌশল ও সৃজনশীলতার অংশ হতে পারে।

শিশুরা তাদের ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে থাকে। শিশুর বাহ্যিক চলাফেরা, আচার-আচরণ, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি সবকিছুই সমাজ সংস্কৃতির মাধ্যমে আহরণ করতে পারে। এ কারণে শিশুকে সর্বদা সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত রাখতে হবে। শিশুর মানসিকতাকে মূল্যায়ন করে তার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী, শিশুরা অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। তাকে যা দেখানো হয় সে তারই অনুকরণ করে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, যদি শিশুর সৃজনশীলতাকেও উৎসাহ দেয়া যায় তবে সে আরও উন্নততর সৃজনশীল চিন্তাভাবনার দিকে ধাবিত হতে সক্ষম হবে।

অনেকে মনে করেন, স্মৃতিশক্তির ধারণ ক্ষমতার উপর বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে। যদিও এই কথার কোন সঠিক ভিত্তি নেই। একটি শিশু তখনই বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হবে যখন তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাহলেই শিশু উৎকৃষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন হবে। শিশুর মস্তিষ্ককে যদি পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা হয় তাহলে তা দ্রুত বিকাশ লাভ করবে। এতে করে শিশুদের মস্তিষ্কের ব্যয়ামও হবে।

University of Southerth California* এর একটি জরিপ অনুযায়ী, বাদ্যযন্ত্রের বাদনকৌশল ও একই সাথে কণ্ঠের সংমিশ্রণ মস্তিষ্কের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়াম হতে পারে। ধারণা করা হয় মোটামুটি দুই বছর বয়স পর্যন্ত সুরের ব্যবহার শিশুদের জন্য সুদূরপ্রসারী ফলাফল দিয়ে থাকে। সংগীত শিক্ষা মস্তিষ্কের দুই

* **University of Southerth California- প্রাগুক্ত**

দিকেরই অর্থাৎ সাদা অংশ যা মস্তিষ্কে অনুরণন যোগায় এবং বাদামি অংশ যা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে বার্তা দিয়ে সচল রাখে, উভয়েরই উন্নয়ন ঘটায়। সংগীত প্রশিক্ষণ মেধাকে জালের ন্যায় বিস্তৃত করে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত তৈরিতে এমনকি মনোযোগকেও একীভূত করতে সাহায্য করে ।

University of Rochester এর অন্তর্ভূক্ত **Eastman School of Music in Rochester N.Y**এর প্রফেসর এমেরিটাস **Dr. Roy Ernst** বলেছেন,

> *"Widespread belief that if you didn't begin learning a musical instrument in your childhood or school years, you had missed your chance" তিনি আরও বলেন, "The field of education did not offer many opportunities for adults to learn"*[৩১]

ধারণা করা যায়, এই কথার পরে সংগীতের প্রতি মানুষের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। Dr. Ernst আরও বলেন, যে কোন বয়সের মানুষই চাইলে এই শিক্ষা অর্জন করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাতে পারে।

শিক্ষাগত মাধ্যম হিসেবে বিচার করলে সংগীতই একমাত্র মাধ্যম যা খুবই দ্রুততার সাথে এবং বৃহৎ পরিসরে শিশুর জ্ঞান বিকাশ একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দিকেও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সংগীতের সাহচর্যে শিশুর ভাষাগত দক্ষতা , বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি, শব্দ গঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খুব দৃঢ়তার সাথে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব।

কিন্তু শিশুর শিক্ষাধারায় এ সংঘবদ্ধ সংগীতকে অনেকেই যথার্থ মূল্যায়ন করে না। তবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করে মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, একটি শিশু তখনই যোগ্য শিক্ষা অর্জন করে যখন সংগীত তার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়।

বর্তমানে সংগীতকে বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যার ফলে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে সংগীতের ব্যবহার হচ্ছে। ফলে শিশুরা একে অন্যের সাথে খুব স্বাভাবিকভাবে ভাবের আদান-প্রদান করছে। তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করছে। একটি শিশু যাতে বড় হয়ে মানুষের সাথে তথা সমাজের সামনে দক্ষতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে তারও পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এই সংগীত। তাই বলা যায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুর সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক সর্বোপরি মানসিক যাবতীয় উন্নয়নে সংগীত দেশ, কাল তথা সমগ্র বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

---

[৩১] The joy of learning to play an instrument later in life, Diane cole, The Wall Street Journal, 23 April,2017. https://www.wsj.com/articles/the-joy-of-learning-to-play-an-instrument-later-in-life-149299944

৩.৪ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুতোষ সংগীত

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। যেহেতু শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথমবারের মত পরিমার্জন করা হয়। এমনকি "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০" প্রণীত হওয়ার পরেও ২০১১ সালে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিক্ষণ ফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। আর এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সাথে যেসব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষক সংস্করণ আর যেসব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ে ***"শিক্ষক নির্দেশিকা"*** ও ***"শিক্ষক সহায়িকা"*** প্রণয়ন করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সংগীত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সংগীত হল শাস্ত্রীয় শিক্ষার আধার। সংগীত শিশু মনকে দোলা দেয়। শিশুর স্বাভাবিকতাকে মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলেও দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরে সংগীতকে যথার্থ শিক্ষণের মাধ্যমেও শিশুর জ্ঞান বিকাশ সম্ভব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি "সংগীত" নামক বিষয়টির সংযোজন শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে আমুল পরিবর্তন আনতে পারবে বলে আশা করা যায়। যদিও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত "সংগীত" বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত ***"শিক্ষক নিদের্শিকা"*** রয়েছে । এ সকল নির্দেশিকায় রয়েছে প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সংগীত, স্বরলিপি ও অন্যান্য নির্দেশনা। নির্দেশনায় যেসকল সংগীত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তা আত্মস্থ করতে পারলে শিশুদের ভেতর ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। এছাড়াও শিশুরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়।

গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। জন্মের পর মা তার শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ান। এতেই বোঝা যায় যে, শিশুটি গানের কোন ভাষা বা কথা না বুঝলেও সুরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। আর তাই মায়ের ঘুমপাড়ানি গানও শিশুকে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। শিশুদের মন স্বভাবতই কোমল থাকে। তাই গানের সুর একদিকে যেমন মন আকর্ষণ করে অন্যদিকে মনকে প্রভাবিতও করে। আর তাই শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীতচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এসকল কারণেই প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীতকে একটি অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নকালে সংগীত বিষয়কে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্যতা দেয়া তথা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে যে পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পাদন হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । তবে বর্তমান পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা, শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থান এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে সে বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত সুরের সহজ ও সর্বজনশ্রুত সর্বোমোট ১৩ টি গান নির্বাচন করা হয়েছে। যেন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় স্বল্প চেষ্টায় এই গানগুলো অনুশীলন করতে সমর্থ হয়। এসকল গানের মধ্যে আছে - ছড়া গান, জাতীয় সংগীত, শহিদ দিবসের গান, উদ্দীপনামূলক গান (রণ সংগীত) প্রভৃতি।

চিত্র-০৪ঃ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের সংগীত শিক্ষণ পদ্ধতি

৩.৪.১ ছড়াগান

শিশুতোষ গান বা ছড়া গান শিশুদের মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরাও খুব দ্রুত শিখতে পারে ও আয়ত্ব করতে পারে। ছোট ছোট শিশুদের এই গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখেই এমন সহজ ও সুন্দর ছড়াগান শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গানে আমরা আমাদের মাতৃভাষা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফল, ফুল, মাছ, পশুর নাম দেখতে পাই। সেদিক থেকে এই গানকে দেশাত্মবোধক গানও বলা চলে। এই গানের মাধ্যমে শিশুরা জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ হতে পারে। গানটি লিখেছেন নজরুল ইসলাম বাবু, সুর করেছেন খোন্দকার নুরুল ইসলাম।

প্রিয় ফুল শাপলা ফুল

প্রিয় দেশ বাংলাদেশ

চিত্র-০৪ picture of childrens music education in bangladesh - Google Search

প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা
মায়ের কথার মিষ্টি রেশ।।

প্রিয় পাখি দোয়েল পাখি
প্রিয় সবুজ লাল
আরো প্রিয় জষ্ঠী মাসের
সুবাসী কাঁঠাল
মাঠে রাখালিয়া বাঁশি
ভুলায় যত দুঃখ ক্লেশ।।

প্রিয় নদী পদ্মা নদী
প্রিয় মাছ ইলিশ মাছ
সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল
আর সুন্দরী গাছ
চির সবুজ আমার দেশের
রূপের যেন নেইকো শেষ।।[৩২]

৩.৪.২ উদ্দীপনামূলক গান

স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানকে রণসংগীত হিসেবে নির্বাচিত করেন। মার্চের সুরে সৈনিকদের সারিবদ্ধ পা ফেলবার তালে তালে গানটি বাঁধা হয়েছে। তরুণদের জয়যাত্রার জন্য উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আর ছন্দের ঝোঁকে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য সহজ তালে এবং সুরে এই গান রচিত হয়েছে। যেহেতু গানের সুর ও তাল নওজোয়ানদের মধ্যে একটি গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তাই এই গানকে উদ্দীপনামূলক গানও বলা হয়। শিশুর মেধাবিকাশে এই ধরণের গান জাতীয়তাবাদকে আরো অনুপ্রাণিত করে। গানটি নিচে দেয়া হলো-

চল চল চল উর্ধ্বগগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল

[৩২] ফেরদৌসী রহমান, সুধীন দাস, মোঃ কামরুজ্জামান, রীনাত ফওজিয়া, শিক্ষক নির্দেশিকা সংগীত, প্রথম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৭

অরুণপ্রাতের তরুণদল

চল রে চল রে চল ।।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাবো তিমির রাত

বাঁধার বিন্ধ্যাচল

নব নবীনের গাহিয়া গান

সজীব করিব মহাশ্মশান

আমরা দানিব নূতন প্রাণ

বাহুতে নবীন বল।

চলরে নওজোয়ান শোন রে পাতিয়া কান

মৃত্যুতোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান

ভাঙরে ভাঙ আগল

চল রে চল রে চল।।[৩৩]

চিত্র- ০৫ঃ শ্রেণীকক্ষে সংগীতের সাথে শিশুদের উল্লাস

৩.৪.৩ শহিদ দিবসের গান

১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্থাপনের জন্য পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে জীবন দিতে হয়েছিল রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ আরো অনেক ভাইকে। আজকের

[৩৩] তদেব, পৃষ্ঠা-২৮

চিত্র-০৫ picture of childrens music education in bangladesh - Google Search

বাংলাদেশ তথা বাংলাভাষার পিছনে আছে সেই সব শহিদ ভাইদের দেশপ্রেম। তাদের রক্তে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েক ছত্র নিয়ে রচিত হয়েছে শহিদ দিবসের গান। এই গানই পরবর্তীকালে প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে গাওয়া হয়। এই গানের সুর দিয়েছিলেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরতরে নিখোঁজ হন। সেই অমর গানটি নিচে তুলে ধরা হল-

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।
আমার সোনার দেশের রক্তে
রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।[৩৪]

৩.৪.৪ জাতীয় সংগীত

পাকিস্তানি শাসনামলে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর এই বাংলার মানুষ কোনভাবেই পূর্ব পাকিস্তান নামকরণে সন্তুষ্ট ছিল না। পরে পাকিস্তানিদের হাতে শাসন শোষণের উপযুক্ত জবাব হিসেবে বাঙালিরা স্বাধীনতার ডাক দেয়। নির্যাতিত, নিপীড়িত বাঙালি হয়ে ওঠে বজ্রকণ্ঠের অধিকারি। তারাও আন্দোলনের ডাক দেয়। এই আন্দোলনে সাড়া দেয় কোটি বাঙালি। শুধুমাত্র বজ্রকণ্ঠের আন্দোলনই নয়, আন্দোলন করে কণ্ঠযোদ্ধারাও। তাঁরাও গণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে গেয়ে চলে দেশের গান। যা সাধারণ মানুষের মনে প্রেরণা যোগায়, উৎসাহ- উদ্দীপনা যোগায়। সহজ সুরে, সহজ ভাষায়, বাংলার মানুষ গেয়ে ওঠে দেশের গান। তাদের কণ্ঠে এক সময় ধ্বণিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলায় জমিদারি তদারকির সূত্রে এসে শিলাইদহের এক হরকরার (গগন হরকরা) মুখে শোনেন বাউল সুরে বাঁধা একটি গান, 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' রবীন্দ্রনাথ এই সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। যা পরবর্তীকালে বাঙালির জাতীয় সংগীতরূপে খ্যাত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক স্তর

[৩৪] তদেব, পৃষ্ঠা-২৬

থেকেই শিশুর মানসিকতায় দেশপ্রেম ফুটে উঠবে বলে আশা করা যায়। সেই অমর জাতীয় সংগীত এখানে তুলে ধরা হল-

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।

ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে

মরি হায় হায় রে মা তোর

ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি

আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা কী ছায়া গো কী স্নেহ কী মায়া গো

কী আঁচল বিছায়েছো বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত

মরি হায় হায় রে -

মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।।[৩৫]

চিত্র - ০৬ঃ শ্রেণিকক্ষে সংগীত শিক্ষায় শিশুদের উচ্ছল অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যা নির্দিষ্ট মালিকানাধীন। এসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মাধ্যম অনুযায়ী পড়াশুনা হয়ে থাকে। যেমন-বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, ইংরেজি ভার্সন প্রভৃতি। যে ধারারই হোক না কেন বাংলাদেশে সরকারি নির্দেশে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সংগীত বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক না থাকলেও সংগীতের সম্পৃক্ততা শিশুদের মনকে প্রভাবিত করে, মানসিকভাবে উদ্বেলিত করে। বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি মাধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই সংগীত শেখানো হচ্ছে। একজন নির্দিষ্ট সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠ্যসূচি তৈরি করে

[৩৫] তদেব, পৃষ্ঠা-২১

চিত্র-০৬ picture of childrens music education in bangladesh - Google Search

এই শিক্ষা দেয়া হয়। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত শিশুর তিন বছর বয়স থেকেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। আর এই বয়সের শিশুদের কিছু শেখানো বা বোঝানোর সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে সংগীত। সাধারণত এই বয়সের শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। ইংরেজি মাধ্যমে যাকে প্লে-গ্রুপ, নার্সারি বলা হয়ে থাকে। শিশুদের মানসিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় এই তিন বছর থেকেই শুরু হয়। এ সময় শিশুকে কিছু দেখে চেনানো, তার ব্যবহার সম্পর্কে জানানো সবকিছুই সুরে সুরে করানো হয়। এতে শিশুর মস্তিষ্কে যে কোন তথ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মস্তিষ্কের উন্নয়ন সাধনপূর্বক শিশু ধীরে ধীরে সুরের সাথে বেড়ে ওঠে ।

৩.৫ আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুতোষ সংগীত

সংগীত একটি বিশেষ পদ্ধতি যা শিখন ও শিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানার্জনের দিক নির্দেশনা দেয়। সংগীত পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা সাংস্কৃতিক চর্চায় সমান গুরুত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে সংগীতের ব্যবহার সবচেয়ে অধিক হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কারণ সেসব দেশের শিক্ষক এমনকি মা-বাবারাও মনে করেন যে, সংগীতের মাধ্যমেই একটি শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ সম্ভব। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বে শিশুদের সাথে সংগীতের সম্পৃক্ততা শুরুই হয় শৈশব বা সদ্যোজাত অবস্থা থেকে। এ সময় শিশুর বাবা-মা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে শিশুর সাথে দৃষ্টির যোগাযোগ স্থাপন করে। তদুপরি শিশুকে বিভিন্ন ছড়া সুর করে শুনিয়ে তাদের ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে। এতে শিশু কানে একটা শ্রুতিমধুর সুর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই জীবনে প্রথমবারের মত শিশু সুরের উপস্থিতি উপভোগ করে। এছাড়াও দেখা যায় শিশুর সুষম মানসিক বিকাশের জন্য দেড় থেকে দুবছরের শিশুকে বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেয় যাতে তারা পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে। এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরাও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ধৈর্য্য সহকারে অত্যন্ত যত্নের সাথে শিশুদের মধ্যে ভাষাগত ও সুরেলা যোগাযোগ স্থাপন করেন। শিশুরাও অত্যন্ত আনন্দের সাথে প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানে এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে শেখে। যা একটি শিশুর সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

চিত্র- ০৭ঃ আন্তর্জাতিক বিশ্বে সংগীত শিক্ষা ব্যবস্থা

এই সকল শিশুদের উপযোগী সংগীতগুলো আন্তর্জাতিক বিশ্বেও শিশুতোষ সংগীত হিসেবে সমাদৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শিশুতোষ সংগীত নিয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা যাক-

সংগীত একটি বিশেষ শাস্ত্র যা বৈজ্ঞানিক অথবা বিশেষভাবে প্রচলিত নিয়মাবলি অনুযায়ী শিখন ও শিক্ষণ মাধ্যমেই কেবলমাত্র এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সংগীত সমানভাবে জনপ্রিয়। তাই সংগীত শিক্ষণেও প্রতিটি দেশ সমানভাবে মনোযোগী। শিক্ষাঙ্গনে সংগীতকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারত, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সংগীতকে শিক্ষা কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এই সংগীত শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু করা হয়। বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয় প্রধানরা মনে করেন, সংগীতের ব্যবহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। **Tara Garcia Mathewson** নামের এক সাংবাদিকের একটি জরিপে দেখা যায়, নিউইয়র্কের বেশিরভাগ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সংগীত শিক্ষার জন্যই বেশিরভাগ সময় দিয়ে থাকে। এসকল শিক্ষার্থীরা ১৯৯৬ সালে যৌথ মালিকানাধীন Kaufman Music Center এর Special Music Center এ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় সংগীত শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়ে থাকে।

চিত্র-০৭ picture of childrens music education - Google Search

চিত্র - ০৮ঃ বহির্বিশ্বে গানের সাথে যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার

এছাড়া, আমেরিকান একজন লেখক **Joanne Lipman, *The Wall Street Journal*** এ সংগীতের ব্যবহার ও চর্চা সম্পর্কে লিখেছেন,

> *"A growing body of evidence suggests that music could trump many of the much more expensive fixes that we have thrown at the education system. Research shows that music training boosts, focus and persistence."*[36]

অতএব বলা যায়, সংগীতের মাধ্যমে শিশুকাল থেকেই যে বিবিধ উৎকর্ষ সাধন করা যায় তা উন্নত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়।

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংগীতের প্রতি আস্থা ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে অনেক শক্তিশালী ও দৃঢ় সংগীত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্কের মত বিভিন্ন দেশে সংগীতকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই আবদ্ধ রাখেনি বরং বিভিন্ন সাংগীতিক কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষের বাইরে জনসমক্ষে এনে শিক্ষাঙ্গনের সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে।

অন্যদিকে কানাডা, ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটের বিদ্যালয়গুলোতে সংগীতকে তুলনামূলক কমবেশি প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। কানাডাতে একটি জরিপে দেখা যায় যে, ৩৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে সংগীতের উপর শিক্ষা দেয়া হয় তাও সংগীতে অপারদর্শী কিছু শিক্ষক দিয়ে। আবার অনেক বিদ্যালয়ে সংগীত বিষয়টিকে পাঠ্যসূচিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

একই হালচিত্র দেখা যায় আমেরিকাতেও। সেখানেও সংগীত কার্যক্রমকে যথার্থ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে না। বিশেষ করে সেখানকার সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে প্রায়শই আর্থিক ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে সংগীত শিক্ষা ব্যহত হচ্ছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে এখনও পর্যন্ত সংগীতের সঠিক অর্থায়ন হচ্ছে। সেখানে ২০১২

---

[৩৬] Joanne lipman, A musical fix for American schools, The wall street journal, 10/10/2014
https://www.wsj.com/articles/a-musical-fix-for-american-schools-1412954652
চিত্র-০৮ picture of childrens music education - Google Search

সালে ব্রিটিশ সরকার ১ মিলিয়ন শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সাংগীতিক বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্য যথেষ্ট অর্থ সহায়তা দানপূর্বক ১২৩ টি সংগীত চর্চাকেন্দ্র স্থাপন করে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ান একটি সাংগীতিক আইনজীবী দল দাবি করে যে, যখন থেকে এদেশে সংগীত শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে তখন থেকেই সেদেশে একটি ভয়াবহ অসমতা তৈরি হয়েছে। আইনজীবী দলের একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় যে, সে দেশের ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোন ধরণের সংগীত শিক্ষা দেয়া হয় না যেখানে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষায় পারদর্শী এমন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যা মোট প্রাইভেট বিদ্যালয়ের মাত্র ৮৮ শতাংশ।

চিত্র -০৯ঃ শিশুরা বাদ্যযন্ত্রের প্রতি উৎসাহী হচ্ছে

অস্ট্রেলিয় আইনজীবী সংগঠনগুলো আরো দাবি করে যে, সেখানকার নিম্নস্নাতকধারী প্রাথমিক শিক্ষকেরা গড়ে মাত্র ১৭ ঘন্টা সাংগীতিক শিক্ষণের জন্য সময় দেন। যেখানে ফিনল্যান্ডে ৩৫০ ঘন্টা শিক্ষনবীশধারী শিক্ষকেরা এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬০ ঘন্টা সংগীত শিক্ষণের জন্য ব্যয় করেন। অন্যদিকে এই সংগঠনেরই জরিপ অনুসারে অস্ট্রেলিয়ায় PISA (Programme for International Student Assesment) নামের একটি শিক্ষামূলক সংগঠন আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং এ দ্রুত সমৃদ্ধি ও সাফল্য লাভ করছে।

এসকল বিভিন্ন অপারদর্শীতা ও অসামঞ্জস্যতার জন্য ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় সরকারি অনুমোদনক্রমে National Music Teacher Mentorship Pilot Programme নামে একটি সংগঠন শুরু হয়। এই কার্যক্রম সংগীত শিক্ষাকে একাধারে সরকারি ও বেসরকারি সকল বিদ্যালয়ে 'সংগীত' নামক বিষয় হিসেবে পাঠদানের জন্য পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে শিশুরা সংগীত শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে নিজেদের জীবন গঠণে সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

চিত্র-০৯ https://www.momjunction.com/articles/music-games-activities-for-kids_00387016/

৩.৬ বাংলাদেশ ও আন্তর্জতিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত সংগীত ধারার তুলনামূলক আলোচনা

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এদেশে স্বাধীনতা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ধাপেই সংগীতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন কণ্ঠযোদ্ধারাও। তারা দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস দিতে, উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক গান গেয়ে গেছেন। তৎকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও এসব গান সম্প্রচারিত হতো। আজও সেসকল গান সমানভাবে সমাদৃত আমাদের সমাজে। বর্তমানে এসকল গানকে স্বাধীনতার গান বা দেশের গান বলে আখ্যায়িত করা হয়। বারো মাসের তেরো পার্বনের এই বাংলাদেশে সংগীত রয়েছে প্রতিটি বাঙালির মনে ও মননে। প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য যেমন আলাদা ধরনের গান রয়েছে তেমনি প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক গানও রয়েছে। লঘু সংগীতের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এসকল বিষয় ছাড়াও নবীন প্রজন্মের মানোন্নয়ন ও মানসিক বিকাশে ছড়া গান বা শিশুতোষ সংগীতের প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুতোষ সংগীতসহ 'সংগীত' বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সংগীত বিষয়ে পাঠ্যবই নিরূপণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদিত পাঠ্যবই না থাকলেও নির্দিষ্ট শ্রেণি অনুযায়ী **শিক্ষক নির্দেশিকা** রয়েছে। যেখানে গানগুলো শিশুদের সামাজিক দায়িত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। মোটকথা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপযোগী সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থার ফলে তা বাংলাদেশ ও উন্নত বিশ্বের শিশুদের সাথে মানবিক মেলবন্ধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্বায়নের হাওয়া লেগেছে। যার ফলে খুব সহজেই বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সাথে সংস্কৃতি চর্চার আদান প্রদান করতে পারছে। নতুন এই যুগে প্রযুক্তি সমাজ সংস্কৃতির এই ধারাকে আরো দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের উপযোগী নানা উপাদান দিয়ে উপভোগ্য সংগীত, কার্টুন, গল্প, ছড়া প্রভৃতি উপস্থাপন করছে। এসকল উপাদান বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শিশুরা এর মাধ্যমেও অনেক উপযোগী তথ্য জানতে পারছে, শিখতে পারছে। শিশুদের ভাষাগত স্পষ্টতা, আচরণের সামাজিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, নৈতিকতা বোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সংগীত তথা শিশুতোষ গান একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। শিশুকাল থেকেই শিশু সকল ধরনের মানবিক গুণাবলির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বড় হওয়ার দরুন সমাজের ভিত্তি প্রস্তর অধিক মজবুত হয়ে উঠছে।

অপরদিকে উন্নত বিশ্বে সংগীত চর্চার প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখা যায়, সংগীত সেখানকার প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। উন্নত বিশ্বে শিশুদের ভাষা শিক্ষার সাথে সাথেই সংগীতের সাহচর্যে নিয়ে আসা হয়। নবজাতকদের ক্ষেত্রে বাবা-মা ই প্রাথমিকভাবে সংগীতের সাথে পরিচিত করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন একাডেমীতে সংগীত শিক্ষার জন্য ভর্তি করানো হয়। ফলে শিশুরা কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি যন্ত্রসংগীত সম্পর্কেও জানতে শুরু করে। তারা সংগীতের সাথে সাথে তাল, লয় সম্পর্কে সচেতন হয়। বিভিন্ন নতুন নতুন যন্ত্র চেনে এবং এদের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়। এছাড়াও সেসকল দেশে শিশুকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে বিভিন্ন সংগীত চর্চা কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। যাতে শিশুরা সংগীতের বিভিন্ন ধারা শেখার পাশাপাশি সামাজিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সচেতন হচ্ছে ও শিক্ষা লাভ করছে। নাগরিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সংগীত সমান ভূমিকা পালন করছে। কিছু কিছু সুবিধাবঞ্চিত দেশ ছাড়া প্রতিটি দেশেই সংগীত শিক্ষাকে বেশ জোড়ালোভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

অতএব তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব উভয়ক্ষেত্রেই সংগীত একটি মানদণ্ডস্বরূপ কাজ করছে। সংগীত বিষয়টি জাতীয় পরিচয়কে আরও ভাস্বর করে তুলছে। তাছাড়াও সংগীতের মাধ্যমে যেকোন সংস্কৃতির ধারাকে খুব সহজেই আদান প্রদান করা যাচ্ছে। তাই বলা যায়, বিশ্ব মানচিত্রে সংগীত বিষয়টি আজ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে একটি মাইলফলক তৈরি করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে শিশুতোষ সংগীতকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুধীজনের সাক্ষাৎকার

বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সংগীত শিক্ষার প্রচলন বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষা চলমান রয়েছে। শিশুদের মন ও মননের নৈতিক উত্তোরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ছাড়াও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এগিয়ে যাচ্ছে একই গতিতে। যা শিশুর মানসিকতার সাথে সংস্কৃতি চর্চার একটি মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে এমন অনেক সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যা অনেক প্রথিতযশা মানুষদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার আলোকে শুরু করেছেন এবং কালের বিবর্তনে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সামাজিক অঙ্গনে। এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়ও শিশুদের মানসিক উন্নয়ন ঘটছে। নিয়মিত সংগীত চর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, বাড়ছে লেখাপড়া ও খেলাধূলার প্রতি মনোযোগ। এরই সাথে শিশুরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেকে তুলে ধরতে পারছে আপন মহিমায়। শিশুদের এরূপ আগ্রহপূর্ণ মানসিকতা তার মেধা বিকাশে কতখানি সহায়ক, এ বিষয়ে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা ও তাদের শিখনের প্রায়োগিক দিক তুলে ধরে মতামত বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এছাড়া অভিভাবকের দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তানদের ক্ষেত্রে মানসিক উন্নয়নে সংগীতের যে ভূমিকা তারও একটি বিশ্লেষণমূলক মতামত এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এসকল দিক বিবেচনায় বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের সাংগীতিক কার্যক্রম এবং এর চলমান ধারা এখানে তুলে ধরা হলো-

৪.১ বাংলাদেশে শিশুতোষ সংগীতকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে প্রাক্ প্রাথমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাড়াও এমন কিছু সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বিভিন্ন ধারার সংগীতের উপর শিক্ষা বা তালিম দেয়া হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিতকরণের লক্ষ্যে সংগীতকে অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়। আর শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির এই ধারাটিকে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয় অভিভাবকমহলে। সংগীতের প্রতি এই আগ্রহ ও অনুপ্রাসের জন্য সংস্কৃতির তথা শিশুর বিকাশের এই আলোকচ্ছটা উন্মোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অনেক সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যদিও এসব সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র বা সংগীত চর্চা কেন্দ্রে সব বয়সী শিক্ষার্থীদেরই গান শেখানো হয়, তারপরেও গবেষণাকর্মে সঠিক তথ্য তুলে ধরার লক্ষ্যে শিশুবিভাগকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। শিশুরা তাদের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পড়াশুনার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষাকেও সমান গুরুত্বের সাথে দেখছে। আর শিশুদের এধরণের কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে অভিভাবকদেরও যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের এমন গুরুত্ববহ, জাতীয় পর্যায়ের ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস করা হলো-

৪.১.১ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের জন্য নির্মিত বাংলাদেশের একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের নিমিত্তে বাংলা সংস্কৃতিকে প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য দেশের শিশুদের শারিরীক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে ঢাকার সদর দপ্তরসহ শিশু একাডেমির মোট ৭০টি শাখা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে একাডেমির কার্যক্রম ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীকালে এর শাখা সারা দেশে বিস্তৃত হয়। শিশু একাডেমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ছয়টি বিভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- প্রশাসন, প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক, জাদুঘর, গ্রন্থাগার ও হিসাব বিভাগ। তবে এসকল বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কেন্দ্রিয় কার্যালয় থেকে। আর সারা দেশের জেলা ও উপজেলা শাখাগুলি এসকল কর্মসূচি অনুসরণ করে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালনা কার্য সম্পাদনে নিজস্ব কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;
- শিশুদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে শিশুদের সহায়তা করা;
- শিশুদের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে সাহায্য করা;
- শিশুদের কল্যাণে নিয়েজিত সরকারি ও বেসরকারি, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ও সহযোগিতা করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিশুদের সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সমবায় সমিতি গঠণ ও কুটির শিল্প স্থাপনে শিশুদের উৎসাহিত করা;
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিশুদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা।[৩৭]

এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সারা বছরই কোন না কোন উদ্দীপনামূলক আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। শিশুদের মানসিক জড়তা দূরীকরণে, তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে। শিশুদের মেধার বিকাশের জন্য শিশু উপযোগী বিভিন্ন বই, মাসিক পত্রিকা, কোষগ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশ

[৩৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Shishu_Academy

করে থাকে। শিশুদের পাঠের সুবিধা সৃষ্টি এবং পাঠ্যাভ্যাস গড়তে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি, যেমন-কুইজ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে। শুধুমাত্র সংগীতই নয় শিশুদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চিত্রাংকন প্রতিযেগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে শিশু সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করা হয়ে থাকে। শিশুদের বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক তথ্যসমৃদ্ধ শিশু জাদুঘর পরিচালনা করে। এছাড়াও জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসহ রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহ্যগত আচার অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বছরব্যাপী যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা'। এছাড়াও শিশু একাডেমির দ্বিতীয় বৃহত্তম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে 'মৌসুমী প্রতিযোগিতা'। বর্ষার সময়ে শিশুদের কর্মব্যস্ত রাখার জন্য এবং শিশুদের মধ্যে দলগত সমঝোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'শিশু আনন্দমেলা' হচ্ছে শিশু একাডেমির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। শিশুদের তৈরি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও হস্তশিল্প এই মেলায় প্রদর্শিত হয়। শিশু একাডেমিতে শিশুদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে চিত্রাংকন, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, আবৃত্তি, উচ্চারণ ও সরব পাঠ, তবলা, গীটার, স্পোকেন ইংলিশ ও কম্পিউটার বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। দেশের বিশিষ্ট লেখকদের মানসম্মত শিশুসাহিত্য রচনায় আগ্রহী করে তুলতে ১৯৮৯ সালে প্রবর্তন করা হয় 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' যার মূল্যমান ২৫ হাজার টাকা। জাতিসংঘের ঘোষণাকৃত ৫৪ টি ধারার সংকলনে শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কাজ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে সংগীতের সাথে সম্পৃক্ত করতে শিশু একাডেমির একটি প্রকল্প হলো ' শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প'। এছাড়া শিশুদের নৈতিকতামূলক সহজ শিক্ষণের জন্য পরিচালিত হচ্ছে 'সিসমপুর আউটরিচ প্রকল্প'। দেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে শিশুদের মেধার বিকাশে শিশু একাডেমির এসকল পদক্ষেপ প্রতিনিয়তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

চিত্র-১০ ঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মূল ভবন

৪.১.২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল বাংলাদেশ রূপকল্পে নির্মিত বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল ভেঙে জাতীয় সংসদের এক বিধিবলে ঢাকার রমনা থানার সেগুনবাগিচায় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। চারুকলা, সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকলার চর্চা ও প্রসারই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সংস্কৃতির এসব ধারার বিকাশের স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গুণী শিল্পীদের যথাযথ মূল্যায়ন, যেমন- প্রতিভাবান শিল্পীদের সক্রিয় সহায়তা ও স্বীকৃতি প্রদান, অতীত ঐতিহ্য ও সমকালীন সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং সংগীত, নাট্য ও চারুকলা বিষয়ে আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসব আয়োজন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই হলো জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল বাংলাদেশ গঠণ। সকল বয়সের, সকল অবস্থানের মানুষই সংস্কৃতির এই অববাহিকায় নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। তবে এখানে বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী সংগীত বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শিশু বিভাগ এবং সাধারণ বিভাগ। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত, শাস্ত্রীয় সংগীত, যন্ত্রসংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, আবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র ১০ ঃ https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fen.banglapedia.org%2Findex.php%3Ftitle%3DBangladesh_Shishu_Academy&psig=AOvVaw3ZwC1gj27Qy_-S1uXPsJ- d&ust=1620497226700000 &source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNih4d-UuPACFQAAAAAdAAAAABAD

সকল বিভাগেই এ সকল ধারারই শিক্ষণ ব্যবস্থা সচল রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশে এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

চিত্র- ১১ ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মূল ফটক

৪.১.৩ নজরুল ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৮৫ সালে ঢাকার ধানমন্ডিতে কবির বাসভবনে নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হয়। এটি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কবির রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা করা, পাশাপাশি তাঁর সংগীতসহ যাবতীয় রচনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। এছাড়া কবির সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা সভা, বক্তৃতামালা, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বইপত্র, গানের রেকর্ড, টেপ, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এরই সাথে তাঁর গানের বিকৃতিরোধ এবং সঠিক পরিবেশন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে গানের স্বরলিপি প্রণয়ন, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড, ছায়াছবি নির্মাণ ও তদারকি করাও এখানকার একটি বিশেষ লক্ষ্য। এছাড়া নজরুলের লিখিত কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান এবং সর্বোপরি, নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত গবেষণাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবদানের জন্য লেখকদের পুরস্কার প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হিসেবেই বিবেচিত হয়।

চিত্র ১১ ঃ file:///C:/Users/HP/Desktop/Shilpakala-Academy-announces-Shilpakala-Award-2016-.html

কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী প্রমিলা ও সন্তানসহ তাঁর ছবি ও নজরুলের স্মৃতি সংক্রান্ত ১১০ টি চিত্রসহ নজরুল এ্যালবাম এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ১৯৯৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়।

এছাড়া সতেরো খন্ডের নজরুল সংগীতের এক সেট স্বরলিপিও এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বছরেই নজরুলের গানের বাণী ও সুরের শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি 'নজরুলসঙ্গীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদ প্রধানত মূল গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুরের সমন্বয়ে নজরুলসংগীতের প্রমাণীকরণের কাজ করে থাকে। অতি সম্প্রতি নজরুল বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আদি রেকর্ডভিত্তিক নজরুল সংগীতের বাণী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন বয়সী শিল্পীদের সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। সেখানে শিশুদেরও থাকে অবাধ বিচরণ। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় শিশুরাও অংশগ্রহন করতে পারে। এ ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুরাও আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে জানতে পারে, তাঁর গান শিখতে পারে। তাছাড়া নজরুল সম্পর্কিত বই পড়ে তাঁর বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে অবগত হয়। শিশুরা এসকল কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পারছে। বিভিন্ন ধারার গান শিখতে পারছে। শুধুমাত্র গান নয়, শিশুতোষ সাহিত্যও এখানে সংরক্ষণ করা হয়। শিশুসাহিত্য রচনায় নজরুলের অসাধারণ সাফল্য অনস্বীকার্য। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও তাতে লিখিত বিভিন্ন কবিতা শিশুদের জন্য নজরুলের অনবদ্য এক একটি সৃষ্টি। 'ঝিঙেফুল', 'খুকি ও কাঠবিড়ালী', 'মা', 'খাদু-দাদু', 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা', 'চিঠি', 'লিচুচোর', 'হোঁদল কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন', 'প্রভাতী' ইত্যাদি শিশুদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। এছাড়াও সংগীতের দিক দিয়ে 'প্রজাপতি' গানে শিশুর কাছে প্রজাপতির বিচিত্র সুন্দর রূপ ও তার মুক্ত জীবনের সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নজরুল। আর এ সকল অভূতপূর্ব সৃষ্টি সংরক্ষণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে ভূমিকা রেখে চলছে।

চিত্র-১২ ঃ নজরুল ইনস্টিটিউট এর মূল ভবন

চিত্র ১২ঃ https://www.thedailystar.net/arts-entertainment/nazrul-institute-carrying-national-poets-legacy-forward- 1275427

৪.১.৪ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক ব্যক্তিমালিকানাধীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। যার সভাপতি আবুল খায়ের লিটু একজন শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা হিসেবে ১৯৮৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। মূলত এই প্রতিষ্ঠানটি বেঙ্গল গ্রুপের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ২০১২ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই সর্বপ্রথম উপমহাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের সুরের ঝংকারে মুখরিত এ অনুষ্ঠান এদেশের সংগীত পিপাসুদের সংগীত তৃষ্ণা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও ২০১৪ সাল থেকে এখানে হিন্দুস্তানী ধারার সংগীতে তালিম দেয়া শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের পন্ডিত ও বিদুষী শিক্ষাগুরুরা এখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কণ্ঠ সংগীত, যন্ত্র সংগীত ও নৃত্যসহ সংস্কৃতিক বিভিন্ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশকে উপস্থাপন করতে এই প্রতিষ্ঠান সদা বদ্ধপরিকর। হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীতের মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাঙ্গের গান শেখানো হয়। এছাড়া যন্ত্রসংগীতের মধ্যে সেতার, সরোদ, বীণা, বাঁশি প্রভৃতিতে গুণী পন্ডিতেরা তালিম দিয়ে থাকেন। তাছাড়া নৃত্যের মধ্যে কত্থক, মণিপুরি, ভারতনাট্যম প্রভৃতি ধারার নৃত্যেরও তালিম দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে। বিভিন্ন বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য এমন কি চিত্রকলারও প্রদর্শনী হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের শিক্ষার্থীরা এখানে তালিম নিতে পারবে। শিশুদের সংগীত শিক্ষার ভিত্তি যদি এখান থেকেই সফল ভাবে গড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যতে তারা শাস্ত্রীয় সংগীতকে পড়াশোনার পাশাপাশি সমান ভাবে চালিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এমনকি সংগীতকে এরা ভবিষ্যতে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এমন একটি পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ১৩ ঃ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কার্যালয়

চিত্র ১৩ ঃ https://eng.spdm.ru/bengal-foundation

৪.১.৫ ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন

ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির ধারার এক অন্যতম পুরোধা। বিশেষ করে সংগীত ও নৃত্যকে প্রাথমিক বিষয় হিসেবে নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানি শাসনামলে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তির সম্মুখে, ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। সেসময় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণ ও গায়নে কঠোর বিধিনিষেধ থাকলেও ছায়ানট সোচ্চার কণ্ঠে এই সংগীতের উপস্থাপন করে গেছে। রবীন্দ্রচিন্তা ও চেতনা ধারণ করে সেসময় (পাকিস্তানি শাসনামলে) উদযাপন করা হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী। পাকিস্তানি শাসনামলে এমন একটি বিষয় নিয়ে সরকারের বিপক্ষে এই উৎসব উদযাপনে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। এমন নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কবি সুফিয়া কামালের সাংগঠনিক সভাপতিত্বে এবং ফরিদা হাসানের সম্পাদনায়, মিসেস মহিউদ্দিন, সাইফুদ্দিন আহমেদ, মোখলেছুর রহমান, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন, কামাল লোহানীর মত সদস্যদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন'। এরই ধারাবাহিকতায় ছায়ানটে সংগীত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষণ ও প্রসারে দীর্ঘ সাড়ে চার দশকের অধিক সময় ছায়ানট নিয়োজিত রয়েছে। সংগীত চর্চার ভিত্তি হিসেবে সাধারণ শিক্ষায় ছায়ানটের এ কার্যক্রম দেশের সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। ছায়ানটের একটি বিশেষত্ব হলো প্রতিবছর ঢাকার রমনা বটমূলে 'বর্ষবরণ' উৎসব উদযাপন করা। এছাড়াও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, ঋতুপর্ব (বর্ষাবরণ, শারোদৎসব, বসন্তবরণ) প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিয়মিত উদযাপিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বিভাগ অনুযায়ী শিশু বিভাগও এতে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন ছন্দের গানের মাধ্যমে একটি সুন্দর সকাল উপহারস্বরূপ আমাদের দিয়ে থাকে এই ছায়ানট। শিশুদের এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের ফলে সাংস্কৃতিক ভাবধারার উন্নয়ন ঘটে, সামাজিকতা ও নৈতিকতা সম্পর্কে অবগত হয়। সাংস্কৃতিক তথা মানবীয় বোধ জাগ্রতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু, বয়স্ক তথা সমাজের সকল মানুষ এক ধর্মভাবে উন্নীত হয়, যা মানুষের ধর্ম হিসেবেই সমাজে পরিগণিত। ছায়ানটের পক্ষ থেকে শিশুদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 'নালন্দা'- একটি সাংস্কৃতিক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিশুদের নিয়ে নালন্দার কয়েকটি উদ্যোগ; যেমন: 'সুরের যাদু', 'রঙের যাদু', বিশেষ বা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য 'ভাষার আলাপ', প্রভৃতি আয়োজন প্রতিনিয়ত শিশুর মানসিক বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের নিজ কাজ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে এ প্রতিষ্ঠান। এই কাজের পশ্চাদপটে যে দুজন অসামান্য মেধাধারী কাজ করেছেন তাঁরা হলেন প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুন এবং ওয়াহিদুল হক।

চিত্র-১৪ ঃ ছায়ানট মূল ভবন

চিত্র-১৫ঃ পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে সমবেত পরিবেশনা

৪.১.৬ সুরের ধারা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুযোগ্য প্রাক্তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক এবং বর্তমানে নৃত্যকলা বিভাগের সম্মানিত চেয়ারপার্সন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার হাত ধরে ১৯৯২ সালে 'সুরের ধারা' সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দ্বার উন্মোচিত হয়। 'সুরের ধারা' শুধুমাত্র সংগীত শিক্ষার জন্যই নয় বরং সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম আসরও বলা চলে। সুরের ধারার বিভিন্ন সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'চৈত্র সংক্রান্তি'র অনুষ্ঠান, যা প্রায় এক হাজার শিল্পীর কণ্ঠে ধ্বণিত হয় এবং পরের দিন একই ভাবে এক হাজার শিল্পীর গাওয়া সংগীতের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান মূলত বাংলা নববর্ষের আগমনী হিসেবে বিবেচিত। এক হাজার শিল্পীর একটি সমবেত পরিবেশনা বলে এই অনুষ্ঠানকে 'হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ' ও বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে শিশুদের জন্যও আলাদা বিভাগ ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রধানত মূল ধারার সংগীত বলতে রবীন্দ্রসংগীতকেই বোঝানো হয়। শিশুরা এই ধারার সংগীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, সংগীত স্বভাবতই শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তবে এই মেধাবিকাশের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রসংগীত শিশুর চিত্তে স্থিরতা এনে দেয়। শিশুদের বিভিন্ন ধরণের পরিবেশনা উপস্থাপনের মাধ্যমে মনের ভীতি ও সংকোচবোধ দূরীভূত হয়।

চিত্র ১৪ ঃ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chhayanaut,_by_Murshed.jpg
চিত্র ১৫ ঃ Bangladesh's Chhayanaut gets India's Tagore Award for Cultural Harmony 2015 | bdnews24.com

তাই বলা যায়, শিশুদের উচ্ছল আনন্দ দানে ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

চিত্র-১৬ ঃ বাংলা নববর্ষে উদ্‌যাপিত হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের পরিবেশনা

৪.১.৭ বাফা (Bulbul Academy of Fine Arts)

তৎকালীন পাকিস্তানি শাসনামলে ১৯৫৪ সালে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরই বন্ধু মাহমুদ নুরুল হুদা ১৯৫৫ সালে বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) এর যাত্রা শুরু করেন। যেহেতু পাকিস্তানি শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত তাই প্রথম দিকে বাফা নামেই সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বাংলায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমি নাম দেয়া হয়। সেসময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী রানা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে এবং মাহমুদ নুরুল হুদার সম্পাদনায় এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসনামলের নামকরা ব্যক্তিত্বরা এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। প্রথমদিকে মূলত কণ্ঠসংগীত দিয়েই যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে যন্ত্রসংগীত, নৃত্য ও চারুকলা বিভাগেরও প্রচলন হয়ে থাকে। ঢাকার অভ্যন্তরে ১২ টি এবং নারায়নগঞ্জে ১ টি শাখা নিয়ে মোট ১৩ টি শাখা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বর্তমানে ২৩০ জনের বেশি শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। বাফাতে শিশুদের মানসিক উন্নয়নের জন্য শিশুবিভাগ রয়েছে। চার বছরের এই সার্টিফিকেট কোর্সটির প্রথম দিকে সরগম, পাল্টা, সহজ সুরে সহজ গান অর্থাৎ শিশুদের বোঝার উপযুক্ত গান শেখানো হয়ে থাকে।

চিত্র ১৬ ঃ https://www.ananda-alo.com/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE/

উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিশুদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধি শিশুরাও গান শিখতে পারে। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠান শিশুর মানসিক উন্নয়নমূলক চিন্তাভাবনার জন্য অন্যতম এক ধারা বহন করে। কেননা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষা হয়না। শিশুদের ৩ বা ৪ বছর বয়সে ভর্তি পরীক্ষা নিলে শিশুরা প্রথমেই শঙ্কায় ভুগবে। তাই কোনরূপ পারদর্শীতার প্রেক্ষিতে নয় অভিজ্ঞতা দানের উদ্দেশ্যে বাফা বদ্ধ পরিকর। তাই বলা যায় শুধুমাত্র শিক্ষাগত দিক নয়, শিশুর মানসিক বিকাশেও এই প্রতিষ্ঠান যুগের পর যুগ কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র-১৭ঃ বুলবুল ললিতকলা একাডেমির প্রধান ফটক

৪.১.৮ সুরবিহার

সম্পূর্ণ একক পরিচালনায় পরিচালিত 'সুরবিহার' নামক সংগীত প্রতিষ্ঠানটি ২০০৫ সালে একটি ছোট ঘর থেকে যাত্রা শুরু করে। 'নগরে দরজা শান্তিনিকেতন' প্রতিপাদ্যে মূলত বাংলাদেশের ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা গানের প্রতি আগ্রহীকরণের প্রয়াসেই এই প্রতিষ্ঠানের পথচলা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারি অধ্যাপক অণিমা রায় এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কর্ণধার। গুটি কয়েক শিক্ষার্থী নিয়ে চলমান এই প্রতিষ্ঠান ২০০৬ সালে বছরের মাঝামাঝিতেই সাফল্যের স্বর্ণমুখ দেখতে পায়। এই প্রতিষ্ঠানে সাধারণত রবীন্দ্রসংগীতকেই প্রধান্য দেয়া হয়। পাশাপাশি নজরুলসংগীত, লোকসংগীত, উচ্চাঙ্গ

চিত্র ১৭ঃ https://www.shadow.com.bd/%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%93/

সংগীত, তিন কবির গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, উপস্থাপনা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এগিয়ে চলছে সুরবিহার। এই প্রতিষ্ঠানটির শুরুর দিকে শুধুমাত্র শিশুদের নিয়ে কাজ করতো। তবে সময়ের স্রোতে এই ধারা বাহিত হয়ে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভাগ বিভাজনে শিশুবর্ষ, প্রারম্ভিক, সূচনা, প্রবেশ, বিশেষ বর্ষ প্রভৃতি চলমান রয়েছে। শিশুবর্ষকে ২ বছরে ভাগ করা হয়েছে এবং এখানে ৩ থেকে সাড়ে তিন বছরের শিশুকে ভর্তি করানো যায়। তবে যদি কোন শিশু ২ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে সেক্ষেত্রে নতুন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করানো হয়না। কারণ একটি শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর পরিপূর্ণ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষাকে সমমানে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর বেড়ে ওঠাকে আরো সমৃদ্ধকরণে উদ্বুদ্ধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। মাধ্যম যা ই হোক না কেন শিক্ষার সাথে মানসিক উন্নয়নের মেলবন্ধন করে সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়েই সুরবিহার এগিয়ে চলছে নিজস্ব গতিতে। যা একটি শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করে।

৪.২ সুধীজনের সাক্ষাৎকার

শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বিজ্ঞানেরও নির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। সেদিক বিবেচনা করলে সংগীত যে শিশুর মানসিক বিকাশের অন্যতম পন্থা এ বিষয়ে বিজ্ঞানও একমত পোষণ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ব্যবহারই শুধু নয় দৈনন্দিন জীবনে শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সংগীতের একটি মহৎ ভূমিকা রয়েছে। জন্ম থেকে শুরু করে জীবন চলার প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনে সংগীতের প্রয়োজন ঘটে। শিশুরা তার মধ্যে সর্বাগ্রে। কারণ শিশুর জীবনের শুরুটাই হয় সুরের মধ্য দিয়ে। ঘুমপাড়ানি গুনগুন গান থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত সংগীতের সাথে শিশু আষ্টেপৃষ্ঠে থাকে। সাথে পরিবারের সাহচর্য এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। শিশুতোষ সংগীতের এরূপ বিবিধ বিষয় নিয়ে কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদের পরামর্শ ও মতামত গবেষণাকর্মের এ পর্যায়ের বিষয়। এছাড়াও এরই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন শিক্ষক ও অভিভাবকের মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে তাদের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার সংযুক্ত করা হলো-

৪.২.১ মনস্তত্ত্ববিদদের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার- ০১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**নাজিয়া হোসাইন**
পদবী	কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট
কর্মরত স্থান	বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	৭ মার্চ, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীত হলো শিশুদের উপযোগী সংগীত যেখানে শিশুদের চিন্তাভাবনাগুলো তাদের মত করে উপস্থাপন করা হয়।

২. একটি শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীত কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ একটি শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীতের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগীত শিশুকে শান্ত করে, অস্থিরতা কমায় এবং শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

৩. মনস্তাত্ত্বিক বিচারে শিশুর বিকাশের বয়স কিভাবে বিভাজন করা হয়?

উত্তরঃ মনস্তাত্ত্বিক বিচারে শিশুর বিকাশের বয়স সাধারণত তিন ভাগে বিভাজন করা হয়।

i Early Childhood (birth to eight years)
ii Middle Childhood (eight to twelve years)
iii Adolescence (twelve to eighteen years)

৪. বিকাশকালীন সময়ে উপযোগী মাধ্যম কি কি হতে পারে?

উত্তরঃ বিকাশকালীন সময়ে উপযোগী মাধ্যম হতে পারে সংগীত, ছবির বই, বিভিন্ন ধরণের খেলনা সামগ্রী এবং বিভিন্ন ধরণের বা বিষয়ের উপর গল্পের বই। যার ফলে শিশুরা গল্পে ছবি এবং সংগীতের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখতে পারে।

৫. শিশুর বিদ্যালয়ের গন্ডিতে প্রবেশের বয়স আনুমানিক কত হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স ৫/৬ বছর হতে পারে। ৫ বছর হলেই বিদ্যালয়ে গেলে শিশুরা বাইরের পৃথিবীর সাথে আত্মীকরণ করতে সমর্থ হবে।

৬. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। প্রথমত এটি তার কাছে মজার একটি খেলা। বাচ্চারা যখন একসাথে সুর করে ছড়া বা গান গায় তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই। শিশু একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিদ্যালয় জীবন শুরু করে । সেসময় শিশু যা দেখে, যা শোনে তারই অনুকরণ করবে। তাই সংগীতের মাধ্যমে যদি শিশু সামজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তা ভবিষ্যৎ জীবনেও উপকারে আসবে।

৮. একজন শিশু মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সাথে কি কি শিক্ষা উপাদান উপযুক্ত বলে মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সাথে প্রয়োজন বাবা মায়ের আন্তরিক সাহচর্য। এর সাথে উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষামূলক বিভিন্ন উপকরণ, ভাই বোনের সাহচর্য।

৯. Music therapy for children বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ Music therapy for children বলতে বোঝায় সংগীতের মাধ্যমে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো।

১০. কি ধরণের বা কোন পর্যায়ের শিশুদের মিউজিক থেরাপি দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ যে ধরণের শিশুরা অস্থির, কোন কিছুতে মনোযোগ রাখতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে মিউজিক থেরাপি খুব ভালো কাজ করে।

১১. বিদ্যালয়ের প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য যা যা উপযোগী বলে মনে করেন তা উল্লেখ করুন বা পরামর্শ দিন।

উত্তরঃ প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য খেলার মাধ্যমে শিক্ষার সাথে পরিচয় করানো হয় এবং সংগীতের সাহায্যে তাদের মানসিক বিকাশে উন্নতির ক্ষেত্রে জোর দেয়া উচিৎ।

১২. একজন শ্রেণি শিক্ষককে কিভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশের সহযোগী হয়ে ওঠা উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ একজন শ্রেণি শিক্ষককে প্রথমত শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যা একটি শিশুর মানসিক বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সাক্ষাৎকার- ০২

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**উম্মে কাওসার**
পদবী	সহকারি অধ্যাপক ও এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট
কর্মরত স্থান	এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	৯ মার্চ, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুর বয়স অনুযায়ী শিশুর বিকাশের জন্য যে সংগীতগুলো লেখা হয় সেগুলো শিশুতোষ সংগীত। যেমনঃ twinkle twinkle little star কবিতাটি ছড়াকারে এবং সুর করে উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আগে খেয়াল করতে হবে শিশুর জন্য সেটা বোধগম্য বিষয় কি না! শিশুর মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই তা শিশুতোষ সংগীত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. একটি শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীত কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ আমার মতে শিশুর মেধার বিকাশে সংগীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন: খুব সাধারণ বিষয়, সংগীতের প্রয়োগ শিশুর শরীর, মন, অনুভূতি, ভাষাগত দক্ষতা প্রভৃতি উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাখে।

৩. মনস্তাত্ত্বিক বিচারে শিশুর বিকাশের বয়স কিভাবে বিভাজন করা হয়?

উত্তরঃ শিশুর বয়স অনুযায়ী বিভাজন যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে জন্ম থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত একরকমভাবে শিশুর মানসিক উন্নয়ন হয়। এসময় শিশু শুধুমাত্র অনুকরণ করে যেকোন কিছু আয়ত্ব করে। এরপর আসে ১৮ মাস থেকে ৩ বছর। এ সময় শিশু বাহ্যিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করে নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এরপর ৩ থেকে সাড়ে চার বছর এবং সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা সংগীতের প্রতি নিজস্ব একটা উৎসাহ তৈরি করে যা তাদের মানসিক বিকাশে ব্যপক প্রভাব ফেলে।

৪. বিকাশকালীন সময়ে উপযোগী মাধ্যম কি কি হতে পারে?

উত্তরঃ বিকাশকালীন সময়ের উপযোগী মাধ্যম বলতে সংগীতের পাশাপাশি ছবি আঁকা, খেলাধূলা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

৫. শিশুর বিদ্যালয়ের গন্ডিতে প্রবেশের বয়স আনুমানিক কত হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ এই বিষয়টি নির্ভর করে শিশুর বেড়ে ওঠার ওপর। বর্তমানে বেশিরভাগ বাবা-মা ই প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুকে ভর্তি করার আগে কিন্ডারগার্টেন বা প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণিতে শিশুকে ভর্তি করে। এতে শিশু মানসিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হয় এবং নিজেকে তৈরি করার মত দক্ষতাও অর্জন করে। তাই আমার মতে বয়স এবং মানসিক বিকাশ অনুযায়ী শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো উচিত।

৬. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তর ঃ পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশের একটি বড় জায়গা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। কারন সেখানে শিশু বন্ধু তৈরি করতে পারে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হতে পারে, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার মত সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। শিক্ষাঙ্গনে যদি শিশুতোষ সংগীতের প্রচলন করা হয় সেক্ষেত্রে শিশু পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এর একটি উদাহরণ হতে পারে baby shark mommy shark গানটি। এই গানে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার একটা পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

উত্তরঃ আমাদের জাতীয়তাবোধ উন্মোচনে যেখানে সংগীত একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে সেখানে শিক্ষাঙ্গনে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা জাতিগতভাবে আমাদের আনেকটা দৃঢ় করবে বলে আমার ধারণা। সংগীত যেহেতু গুরুমুখী বিদ্যা, তাই শিখন এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্য শিক্ষাঙ্গনে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা আনেক বেশি।

৮. একজন শিশু মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সাথে কি কি শিক্ষা উপাদান উপযুক্ত বলে মনে করেন?

উত্তরঃ বিভিন্ন যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত, খেলাধূলা প্রভৃতি মাধ্যম শেখার উপযোগী করে তুলে ধরলে তা শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে বলে আমার মতামত।

৯. Music therapy for children বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ মিউজিক থেরাপি বলতে একটি শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য সংগীতের ব্যবহারকে বোঝায়।

১০. কি ধরণের বা কোন পর্যায়ের শিশুদের মিউজিক থেরাপি দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুদের ক্ষেত্রে থেরাপি বিষয়টা নির্ভর করে nature of issue এর উপর। অর্থাৎ বয়স অনুযায়ী সংগীতের মাধ্যমে শিশুর মানসিক উপযুক্ততা তৈরি করার জন্যই মূলত মিউজিক থেরাপির দরকার হয়।

১১. বিদ্যালয়ের প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য যা যা উপযোগী বলে মনে করেন তা উল্লেখ করুন বা পরামর্শ দিন।

উত্তরঃ প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা বয়সে খুবই ছোট। এই বয়সে তারা প্রথম বাবা-মায়ের হাত ছেড়ে বিদ্যালয়ের গন্ডিতে প্রবেশ করে। তাই এই পর্যায়ের শিশুদের নিরাপদ একটা পরিবেশ প্রথমেই দেয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া কারও সাথে তুলনা না করে প্রতিটি কাজে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

১২. একজন শ্রেণি শিক্ষককে কিভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশের সহযোগী হয়ে ওঠা উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ একজন শিক্ষককে অবশ্যই পর্যাপ্ত ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল হতে হবে। এই বয়সের শিশুরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিসের বায়না করতে পারে। তাদেরকে অনুৎসাহিত না করে তাদের কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

সাক্ষাৎকার- ০৩

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**নাফিসা ফেরদৌসি**
পদবী	সহকারি অধ্যাপক
কর্মরত স্থান	এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	১৪ মার্চ, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুদের আচরণের উন্নয়ন, বর্ণমালা প্রয়োগ, নৈতিকতামূলক বিভিন্ন গল্প যা সুর করে শিশুদের সামনে উপস্থাপন করা হয় সেগুলোকেই শিশুতোষ সংগীত বলা হয়।

২. একটি শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীত কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ সংগীত বা গানের মাধ্যমে শিশুর মনের ভাব প্রকাশে যে সৃজনশীলতা তা তার মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। শিশুদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে বিষয় বেছে নিয়ে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে শিশুর মানসিক বিকাশের অবস্থা বোঝা যেতে পারে।

৩. মনস্তাত্ত্বিক বিচারে শিশুর বিকাশের বয়স কিভাবে বিভাজন করা হয়?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশ মূলত বয়স অনুযায়ী ধাপে ধাপে হয়ে থাকে। যেমনঃ সদ্যোজাত থেকে এক মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর খুব একটা মানসিক বিকাশ হয়না। কিন্তু এরপর এক বছর পর্যন্ত যে সময় তাতে শিশু তার প্রকাশভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব বুঝিয়ে দিতে পারে। এরপর প্রথমে তিন বছর ও পরে পাঁচ বছর সময় পর্যন্ত ধাপে ধাপে তাদের মানসিক বিকাশ হয় এবং তারা ধীরে ধীরে দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। আর এভাবেই একটি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করে বিভাজন করা হয়।

৪. বিকাশকালীন সময়ে উপযোগী মাধ্যম কি কি হতে পারে?

উত্তরঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুর উপযোগী মাধ্যম হিসেবে মোবাইল, টেলিভিশনকেই বেছে নেয়া হয়। এসবের মাধ্যমে শিশুর উপযুক্ত বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি ছড়া বা গল্প শিখতে পারে, সুরে সুরে বিভিন্ন রঙের নাম জানতে পারে। তবে শিশুদের জন্য এগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার অনুপযোগী।

অনেক অভিভাবকরা সচেতনতা অবলম্বনের জন্য এবং এসব থেকে শিশুকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেয়। এছাড়া অনেক শিশুরা সংগীত ব্যতীত সংস্কৃতির অন্যান্য ধারা যেমন ছবি অঁকা, খেলাধূলা প্রভৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। তাই তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সেসকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয় যেখানে শিশু ভবিষ্যতে সৃজনশীল মানসিকতা তৈরিতে সক্ষম হয়।

৫. শিশুর বিদ্যালয়ের গন্ডিতে প্রবেশের বয়স আনুমানিক কত হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক চিন্তনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে পাঁচ বছর বা সাড়ে পাঁচ বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ব্যবহার শিশুকে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যা শিশু তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের মাধ্যমে আরও দক্ষ হয়ে ওঠে। শিক্ষাঙ্গনের সংগীত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর মধ্যে বহির্মুখী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। সামাজিকতা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করে।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

উত্তরঃ শিশুকে যখন প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয় তখন সাধারণত সবকিছু সুরে সুরেই শেখানো হয়। এখানে সংঘবদ্ধভাবে বা দলগত শিক্ষণেরও প্রভাব রয়েছে। এটা মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. একজন শিশু মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সাথে কি কি শিক্ষা উপাদান উপযুক্ত বলে মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল শিক্ষাগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিশুর মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শারিরীক বিকাশও জরুরি। সংগীতের পাশাপাশি বিভিন্ন ধারার খেলাধূলা, ছবি আঁকা, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতি উপাদান শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।

৯. Music therapy for children বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ যদি কোন শিশু সংগীত পছন্দ করে কিন্তু সে মানসিকভাবে বিষাদগ্রস্ত, তার সেই মানসিকতাকে সংগীতের মাধ্যমে উত্তোরণ করা সম্ভব তার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করাই হলো মিউজিক থেরাপি।

১০. কি ধরণের বা কোন পর্যায়ের শিশুদের মিউজিক থেরাপি দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ মিউজিক থেরাপি সাধারণত কোন বিশেষ ধরণের বাচ্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ শিশুদের পাশাপাশি বিশেষ বা প্রতিবন্ধী শিশুরা এই থেরাপি নিয়ে থাকে। মূলত এই থেরাপি সাধারণ শিশুর চেয়ে বিশেষ ধরণের শিশুর জন্য বেশি প্রযোজ্য।

১১. বিদ্যালয়ের প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য যা যা উপযোগী বলে মনে করেন তা উল্লেখ করুন বা পরামর্শ দিন।

উত্তরঃ বিদ্যালয়ের প্রধানদের প্রাক্ প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য সাংগীতিক উন্নয়ন বিষয়টির ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। সাথে সাথে এই উদ্যোগকে ফলপ্রসু করার জন্য দ্বিধাহীনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

১২. একজন শ্রেণী শিক্ষককে কিভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশের সহযোগী হয়ে ওঠা উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকই সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে ওঠে। তাই একজন শিক্ষকের শিশুর ভেতরের সৃজনশীলতা বের করে আনার জন্য সর্বোচ্চ সহনশীল আচরণ করা বাঞ্ছনীয়।

৪.২.২ শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার- ০১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**আব্দুর রহিম স্বপন**
পদবী	সহকারি শিক্ষক
কর্মরত স্থান	গোহারুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুদের চিত্ত বিনোদনের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র স্বর, সুর ও তালবদ্ধ রচনাকে শিশুতোষ সংগীত বলে।

২. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সংগীত ও মানবজীবন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ভিতরের প্রবৃত্তির উপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। একদিকে যেমন সাধারণ শিক্ষা মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, অন্যদিকে সংগীতের অনুশীলন দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত ভাব জাগ্রত হয়। সংগীত দ্বারা মানুষের অনুভূতি পরিমর্জিত হয়। কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পাশাপাশি মনের হীন ভাবগুলো সংগীতের প্রভাবে দূর হয়। সংগীতের মাধ্যমে শিশুদের কল্পনাশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ হয়। মনের কোমল বৃত্তিগুলোর উপর সংগীতের প্রভাব জীবনকে করে তোলে আরও মধুময়, জীবনে বয়ে আনে সম্পূর্ণতা। কাজেই বলা যায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. শিশুর মেধাবিকাশে সংগীত কিভাবে সহায়তা করে?

উত্তরঃ গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জন্মের পর মা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুটি গানের কোন ভাষা না বুঝলেও গানের সুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শিশুমন কোমল থাকে, তাই গানের সুর একদিকে যেমন তার মনকে আকৃষ্ট করে অন্যদিকে তার মনকে প্রভাবিত করে সংগীতের মাধ্যমে শিশুমনে মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী হবে। তাই শিশুর মেধা বিকাশে সংগীত চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সংগীত মানবজীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখে স্বস্তির প্রলেপ। সংগীত সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। জীবনের উৎসবে সংগীত নিত্যসঙ্গী। আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হলো এই সংগীত যা মানবজীবনকে পরিশীলিত করে এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করে। তাই মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ ইউনিসেফের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে শিশুদের মেধার সৃজনশীল বিকাশ ঘটতে থাকে। এই সময় তাদের যেভাবে গড়ে তোলা হয় সেভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো উচিৎ। তবে বেশিরভাগ শিশু বিশেষজ্ঞগণ ছয় বছর বয়সে শিশুদের বিদ্যলয়ে ভর্তি করানোর জন্য মতামত প্রদান করেন।

৬. শিক্ষক হিসেবে শিশুদের সহজ পাঠদানের মাধ্যম কি হতে পারে?

উত্তরঃ শিশুদের সাধারণত চিন্তাশক্তি অনেক কম থাকে। তাই কোন বিষয়ে তাদের বিশ্লেষণমুখী বা বইয়ের ভাষায় পাঠদান দিলে তারা পাঠ্যবিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেনা। শিশুরা সাধারণত সংগীত চর্চা কিংবা খেলাধূলার প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকে। তাই শিশুদের বিভিন্ন খেলাধূলা কিংবা সংগীতের মাধ্যমে পাঠদান করলে কার্যকর ফল পাওয়া যায় এবং শিশুরাও সহজে পাঠ আয়ত্বে আনতে পারে।

৭. শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের ক্ষেত্রে সংগীতের উপকারিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আমাদের গতানুগতিক পাঠদান ব্যবস্থা কোমলমতি শিশুদের মনকে আকর্ষণ করতে পারেনা। যেকোন পাঠে যদি শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা না যায় তাহলে সেই পাঠ থেকে শিক্ষক ভালো ফলাফল পাবে না। কাজেই শিশুরা যেহেতু সংগীতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকে তাই তাদেরকে সংগীতের মাধ্যমে পাঠদান দিলে তারা পাঠের বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবন করতে পারে।

৮. শিশুতোষ সংগীতগুলোর উপকরণ বা বিষয় কি কি হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীতগুলোর বিষয় সাধারণত গীত বা গান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ইত্যাদি হওয়া উচিৎ।

৯. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীাত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কারণ সংগীত শিশুমনকে দোলা দেয়। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুতোষ সংগীতের ক্ষেত্র শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত সংগীতগুলোর বাস্তব অনুশীলন দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটবে এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

১০. শিশুর মানসিক উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক উন্নয়নে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বসুলভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে শিশুর মনে কোন ভয় ভীতি কাজ করবে না। কারণ শিক্ষার্থীর মনে ভয় থাকলে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করতে পারবে না। যা তার মানসিক বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করে। কাজেই শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সংগীতের মধ্যে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া উচিৎ।

সাক্ষাৎকার- ০২

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**অলিয়া সিকদার**
পদবী	সহকারি শিক্ষক
কর্মরত স্থান	মুকুল স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরিশাল।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	২৬ মার্চ, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীত হলো অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লিখিত গান, যা শিশুর বয়স উপযোগী ও চাহিদা অনুযায়ী লেখা হয়েছে, যা শুনে শিশু আনন্দ পায়, খুশি হয়।

২. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সংগীত শিক্ষা শিশুকে আনন্দ দেয়, পাঠে মনোযোগী করে, পাঠের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে। শিশুর সৃজনশীলতা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

৩. শিশুর মেধাবিকাশে সংগীত কিভাবে সহায়তা করে?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীত শিশুর সৃজনশীল কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি করে। শিশুর জরা,ভয়, শঙ্কা দূর করে যেকোন কাজে তাকে উৎসাহী করে তোলে। এর ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। যেকোন কাজে মনোযোগী হতে পারে যা তার মেধা বিকাশে সহায়তা করে।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা বেশিরভাগ সময়ে বিদ্যার্জনে অনুৎসাহিত হয়ে পড়ে। তাই বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে সংগীত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা শিশুর একঘেয়েমি মানসিকতা দূর করে।

৫. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ বিদ্যালয়ে শিশুর ভর্তি হওয়ার বয়স ৫ বছরের বেশি হলে ভাল হয় বলে আমার অভিমত।

৬. শিক্ষক হিসেবে শিশুদের সহজ পাঠদানের মাধ্যম কি হতে পারে?

উত্তরঃ শিশুদের জন্য সহজ পাঠদানে মাধ্যম হিসেবে আমরা বিভিন্ন গল্প, ছড়া, গানকে বেছে নিতে পারি।

৭. শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের ক্ষেত্রে সংগীতের উপকারিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ পাঠদানের পূর্বে ও পাঠদানের সময় শিশুদের পাঠে মনোযোগী করতে সংগীত বেশ উপকারি ভূমিকা পালন করে। কারণ শিশুমন সবসময় চঞ্চল থাকে। কোন কিছু অধিক সময় ধৈর্য্য নিয়ে করতে পছন্দ করে না। এক্ষেত্রে সংগীতের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে পাঠে মনোযোগী করা যায়।

৮. শিশুতোষ সংগীতগুলোর উপকরণ বা বিষয় কি কি হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীতের বিষয় হওয়া উচিৎ সহজ সরল। যার কথা ও সুরে যেকোন তথ্য সহজভাবে শিশুদের কাছে পরিবেশন করা যায়। যা শিশুমনকে সহজেই আনন্দ দেয়, তাদের মনে কল্পনার জগৎ তৈরি করার সাথে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়।

৯. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীতগুলোর মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায়। এক্ষেত্রে কখনো শিশুমনের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়, কখনো সমাজের সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পায় যা রবীন্দ্রনাথের 'আমরা সবাই রাজা' গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আবার 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানের মাধ্যমে শিশুর বন্দী জীবন উপেক্ষা করে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করে।

১০. শিশুর মানসিক উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রী ও সংগীত একে অপরের পরিপূরক। একজন শিক্ষকের সাথে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সংগীত একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। শিক্ষকের সাথে ছাত্রছাত্রীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলে শিশুর মধ্যে সকল ভয়ভীতি শঙ্কা দূর হয়, সে তখন তার শিক্ষকের কাছে মনের সকল ভাবের আদান প্রদান করে।

সাক্ষাৎকার- ০৩

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**উর্মিলা ভৌমিক**
পদবী	সংগীত শিক্ষক
কর্মরত স্থান	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	৯ এপ্রিল, ২০২১

১. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীত বলতে বোঝায় শিশুদের জন্য রচিত ও সুরারোপিত গান যা শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক।

২. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ শিক্ষিত হওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অনেকখানি।

৩. শিশুর মেধাবিকাশে সংগীত কিভাবে সহায়তা করে?

উত্তরঃ সংগীত একদিকে যেমন আমাদের মনোরঞ্জন করে, তেমনি শৈশব থেকেই শারিরীক ও মানসিক অনেক কাজের উপরেও সংগীতের নিবিড় প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও সংগীত শ্রবণে মস্তিষ্ক থেকে ডোপামিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বের হয় যা অনেক কিছু শেখার ক্ষেত্রে একটি শিশুকে প্রেরণা জোগায়।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সংগীতের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজ, পরিবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। ফলে তারা অনেক বেশি সামাজিক ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। নাগরিক থেকে বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠতে এবং একটি সৃজনশীল জাতি গঠনে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অসীম।

৫. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ আমার ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী পাঁচ বছর হওয় বাঞ্ছনীয়। তবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কোমলমতি শিশুদের অভয়াশ্রম এবং আনন্দধাম হয়ে উঠলে আরো আগেই ভর্তি করা যেতে পারে।

৬. শিক্ষক হিসেবে শিশুদের সহজ পাঠদানের মাধ্যম কি হতে পারে?

উত্তরঃ প্রথমত শিক্ষকদের নিজেদেরকে শিশুদের নিকট আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপ না দিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তুলতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় বৈচিত্র্য আনতে হবে।

৭. শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের ক্ষেত্রে সংগীতের উপকারিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ সুর-ছন্দহীন ভাষা শিক্ষা শিশুদের কাছে অনেকটা দুর্বিষহ মনে হতে পারে। বিশ্বের অনেক উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যায় সুরে সুরে শিক্ষাদান করতে। সুরে ছন্দে পাঠদান শিশুদের মনে সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পায়, মনে রাখতে পারে। তাছাড়া সংগীতের চর্চা নিয়মিত করা হয় এমন বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের উপস্থিতি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি থাকে।

৮. শিশুতোষ সংগীতগুলোর উপকরণ বা বিষয় কি কি হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীতের বাণী সহজ, সুন্দর, সাবলীল ও শিক্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। বিষয় হতে পারে কোন প্রাণি, ফুল, ফল, পাখি পরিচিতি বা কোন ব্যক্তি পরিচিতি। হতে পারে দেশপ্রেম বিষয়ক। মোটকথা, শিশুতোষ সংগীতের বিষয় এমন হওয়া উচিত যা আনন্দদায়ক সুর ও ছন্দের মাধ্যমে শিক্ষণীয় হবে।

৯. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক বহু গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের চেয়ে বিভিন্ন কলা বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে সংগীত শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনে অধিক সফলতা অর্জন করছে। তাদের উচ্চারণ অনেক বেশি সুন্দর হয়ে থাকে পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন সামাজিক, সৃজনশীল কর্মকান্ডে অনেক প্রাণবন্ত হয়।

১০. শিশুর মানসিক উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ সংগীতের একজন শিক্ষার্থী এবং পরবর্তীতে সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করে একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে উপলবিব্ধ করেছি, একজন সংগীত শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অনেক আন্তরিকতার হয়। যা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, স্নেহ, ভালোবাসা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় গড়ে ওঠে। আমার শিক্ষার্থীদের দেখেছি তারা তাদের অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়ে আমার কথা বলা, চলন, উপস্থাপনা অনেক বেশি অনুসরণ করে। কাজেই শিক্ষককে তাঁর আচরণবিধি নিয়েও যথেষ্ট সচেতন থাকা উচিত। মোটকথা সংগীত একজন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ককে সাবলীল মধুর ও স্বতঃস্ফূর্ত করে গড়ে তোলে।

৪.২.৩ অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার- ০১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**পলি বোস**
পদবী	গৃহিনী
কর্মরত স্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	১৭ মার্চ, ২০২১

১. শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিশুর বয়স অনুযায়ী সবকিছু ঠিকমতো হওয়াই শিশুর মানসিক বিকাশ।

২. সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করে?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে সংগীত অন্যতম। সংগীত একটি শিশুকে শুদ্ধ উচ্চারণ, সুরেলা কণ্ঠ এবং নীতি আদর্শের পথে পরিচালিত করে যা শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়।

৩. আপনি কিভাবে আপনার সন্তানকে সংগীতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন?

উত্তরঃ সংগীত একটি সাধনা ও অধ্যাবসায়। যেহেতু শিশু বয়স থেকে সংগীতের আরাধনা করা উচিত, সেহেতু একটি শিশুর পূর্ণতা সংগীতের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এইজন্য সংগীতের ভালো দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করলেই একটি শিশু সংগীতের প্রতি আগ্রহী পাশাপাশি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

৪. সংগীত কি আসলেই মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সহায়ক?

উত্তরঃ এটা একটা অনন্য সত্য যে, শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সংগীত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ সংগীত হচ্ছে সাধনা ও শেখার বিষয়। আর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের মূল মন্ত্রই হচ্ছে সাধনা।

৫. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীত হচ্ছে শিশুদের জন্য পরিবেশিত সুর ও ছন্দযুক্ত সংগীত।

৬. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স ৬ বছর হওয়া উচিত।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা কি?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক স্তরগুলি শিশুতোষ সংগীতের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। সুর, ছন্দ, কবিতা ও গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করলে শিশুদের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। এতে করে শিশু শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও কবিতা পাঠের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

৮. শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা ভবিষ্যতে বিশেষ অবদান রাখে।

৯. শিশুদের উপযোগী সংগীত শিক্ষার উপকরণ বা বিষয় কি হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

উত্তরঃ শিশুর সংগীত শিক্ষার সাধারণ উপকরণ হলো হারমোনিয়াম বাজানো এবং প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্যকরণভিত্তিক সংগীতচর্চা।

১০. সংগীত শিশুর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে কতটা ভূমিকা রাখে?

উত্তরঃ সংগীত একটি চলমান সাধনা বা চর্চা যা একটি শিশুর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

সাক্ষাৎকার- ০২

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**অদিতি আহমেদ**
পদবী	সংগীত শিক্ষক
কর্মরত স্থান	ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	১২ মার্চ, ২০২১

১. শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের পরিবারগুলো সেদিকে খুব কম খেয়াল রাখে। বয়সের সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব আচরণ এবং প্রকাশভঙ্গি যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে। সেজন্য আসলে শিশুর মনটা বোঝা জরুরি।

২. সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করে?

উত্তরঃ সংগীত বা গান মানেই হচ্ছে আনন্দ। আর শিশুরা হচ্ছে আমোদপ্রিয়। তাই যদি একটি শিশুর সুন্দর মানসিক বিকাশ আমরা চাই সেক্ষেত্রে সংগীতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। গান শুনলে বা গাইলে বাচ্চাদের যে মানসিক পরিবর্তনটি ঘটে সেটি তাকে তার পরবর্তী কাজে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে।

৩. আপনি কিভাবে আপনার সন্তানকে সংগীতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন?

উত্তরঃ আমি নিজে যেহেতু গান করি সেক্ষেত্রে আমার সন্তান আমাকে রেওয়াজ করতে দেখেই সংগীতের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। আর মূলত সে যেমন গান পছন্দ করে সেটা করতে দিলেই তার আগ্রহ বাড়বে।

৪. সংগীত কি আসলেই মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সহায়ক?

উত্তরঃ হ্যাঁ অবশ্যই। সংগীতের মাধ্যমে যে আনন্দ, প্রশান্তি আসে সেটা তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশেও সহায়তা করে। গানের সুরের মাধ্যমে শিশুমনে আনন্দের দোলা লাগে এবং তার কল্পনার জগৎটি প্রসারিত হয়। এতে তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পথটিও সুগম হয় বলে আমি মনে করি।

৫. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশুদের উপযোগী সহজ কথা ও সুরের গানই আমার কাছে শিশুতোষ সংগীত। আসলে কোমল মনের শিশুদের কাছে অনেক উচ্চমার্গীয় সংগীত কখনোই আনন্দদায়ক হবে না। যে গানে একটি

শিশু আনন্দ পাবে এবং সে আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে সংগীতের প্রতি শিশুতোষ সংগীত তেমনই হওয়া উচিত।

৬. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিয়মের উপরই আসলে নির্ভর করে। তবে ৪ বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যালয়ে ভর্তি করলে ভালো হয় বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। শিশুশ্রেণি অর্থাৎ প্লে-গ্রুপে ৪ বছর পূর্ণ হলে ভর্তি করাই ভালো।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা কি?

উত্তরঃ শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা বিদ্যালয়ে অনেক বেশি বলে আমি মনে করি। শিশুতোষ সংগীতের কথা ও সুরের গাঁথুনি যেমন সুন্দর ও আনন্দদায়ক হয়, সেই গানগুলো শেখার মাধ্যমে কিন্তু সেই শিশুটির মনেও প্রভাব পড়ে। আর সেই প্রভাবে সে পরবর্তী সময়ে তার পড়াশোনার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। মন প্রফুল্ল থাকার কারণে পড়ালেখার প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়।

৮. শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে সংগীতের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে অনেক বেশি। সে আরও বেশি কাজে এবং পড়াশোনায় কর্মচঞ্চল হয়।

৯. শিশুদের উপযোগী সংগীত শিক্ষার উপকরণ বা বিষয় কি হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন

উত্তরঃ শিশুদের উপযোগী সংগীতের বিষয় হিসেবে মূলত ছড়াগানই আমার ভালো লাগে। এছাড়া শিশুদের উপযোগী দেশের গান, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল সংগীত ও রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের গান শেখালে তারা একেবারে শুরু থেকেই আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও একটা পূর্ণ ধারণা পাবে ।

১০. সংগীত শিশুর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে কতটা ভূমিকা রাখে?

উত্তরঃ সংগীত যেহেতু গুরুমুখী বিদ্যা। অর্থাৎ গুরু বা শিক্ষকের কাছে শুনে সেটা কণ্ঠস্থ এবং আত্মস্থ করতে হয় তাই সংগীত শিক্ষার সাথে সাথে মুখস্ত করার বা মনে রাখার বিষয়টিও অভ্যাস হয়ে যায়। আর এটা অবশ্যই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। আর পূর্বেই বলেছি চিত্ত প্রফুল্ল থাকার কারনে পড়াশোনার প্রতিও শিশুর আগ্রহ বাড়ে।

সাক্ষাৎকার- ০৩

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী	**লতিফা মাহমুদা**
পদবী	শিক্ষিকা
কর্মরত স্থান	ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনার স্কুল
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ	৯ এপ্রিল, ২০২১।

১. শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ শিশু জন্মের পর যে শুধু শারিরীক বৃদ্ধি হয় আসলে তা নয়। তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশও হয়। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে একটা শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আসে। যেমন: শিশু ৩ মাস বয়স থেকে হাসতে শেখে। আমি হাসলে সে হাসছে কি না, ডাকলে তাকাচ্ছে কি না, প্রচন্ড শব্দে ভয় পাচ্ছে কি না, বাবা-মা বা কাছের মানুষদের চিনতে পারছে কি না, এ সমস্ত বিষয়গুলো যখন যে বয়সে হওয়া উচিত সেটা যদি সেই বয়সেই হয় তাহলে বোঝা যাবে শিশুর মানসিক বিকাশ সঠিকভাবেই হচ্ছে।

২. সংগীত শিশুর মানসিক বিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করে?

উত্তরঃ শিশুর মানসিক বিকাশে বাবা-মা, পরিবার, প্রকৃতির মত সংগীত বা সুরের অবশ্যই একটা গুরুত্ব আছে। ছোট একটা শিশুর পাশে গান বাজানো হলে দেখা যায় সে মাথা নাড়িয়ে বা দেহ দুলিয়ে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। খেতে না চাইলে গান শুনিয়ে তাকে খাওয়ানো যায়। যেকোন ছড়া গল্পের মত না বলে সুরে সুরে বললে সহজেই সে আত্মস্থ করে ফেলতে পারে। খেলাধূলা শারিরীক বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন মানসিক উন্নয়নের জন্য সংগীতের গুরুত্বও কিছু কম নয়। খেলাধূলায় শরীর ভালো থাকে আর সংগীতের মাধ্যমে মন ভালো থাকে। আমার মনে হয় দিনের কিছুটা সময় গানের জন্য ব্যয় করলে শিশুর যে মানসিক প্রশান্তি হবে সেটা তার মানসিক বিকাশে অনেক ভূমিকা রাখবে।

৩. আপনি কিভাবে আপনার সন্তানকে সংগীতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন?

উত্তরঃ সংগীতের প্রতি অনুরাগ সাধারণত ঈশ্বর প্রদত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সংগীতের প্রতি সন্তানকে আগ্রহী করে তুলতে হলে বাবা মা'র সংগীতপ্রেমী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বাচ্চারা অনুকরণপ্রিয়। ছোট থেকে যা দেখে তা ই শেখে। বাড়িতে সাংগীতিক পরিবেশ থাকলে শিশুরা এমনিতেই সেদিকে আগ্রহী হবে। কারণ সংগীত এমন একটি বিষয় যা সবার হৃদয়কেই আকৃষ্ট করে।

৪. সংগীত কি আসলেই মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সহায়ক?

উত্তরঃ মনস্তত্ত্ব হলো মানসিক প্রক্রিয়া বা মানসিক আচরণ সম্পর্কীয়। সংগীত অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সহায়ক। যেমন আমরা বলতে পারি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত দেশাত্মবোধক গানগুলি প্রচার করা হয় সেগুলো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভীষণভাবে উজ্জীবিত করতো। দেশে ক্রিকেট খেলা হলে ক্রিকেটের উপর যে গান গাওয়া হয় সেটা খেলোয়ারদের সাথে সাথে সারা দেশের মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। বিয়ে বাড়িতে যে সানাইয়ের সুর বাজানো হয় বা বিয়ের গান গাওয়া হয় তা একটা প্রকৃত বিয়ের মহলই তৈরি করে দেয়। মন খারাপের সময় একটা ভালো গান মনকে ভালো করে দেয়। গান মানুষকে কাঁদায়ও। এমন হাজারো উদাহরণ দেয়া যায়। তাই আমার মতে গান অবশ্যই মানসিক বিকাশের সহায়ক।

৫. শিশুতোষ সংগীত বলতে কি বোঝেন?

উত্তরঃ যে সমস্ত গানগুলো শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই লেখা বা গাওয়া হয় সেগুলোই শিশুতোষ সংগীত।

৬. শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় দুইটা মাধ্যম রয়েছে, ইংরেজি এবং বাংলা। ইংরেজি মাধ্যমের একটি শিশুকে ক্লাস ওয়ানে উঠতে গেলে যেহেতু তাকে আরও কয়েকটা ধাপ পার হয়ে আসতে হয়, এতে তার বয়স প্রায় সাড়ে সাত বা আট বছর হয়ে যায়। ধাপগুলো- প্লে, নার্সারি, কেজি ওয়ান, কেজি টু। সেক্ষেত্রে বলা যায় ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রে একটি শিশুকে সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ভর্তি করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলা মাধ্যমে বাড়িতে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করে এবং মোটামুটি লেখা শিখে পাঁচ বছরে ভর্তি করানো যেতে পারে।

৭. শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা কি?

উত্তরঃ শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুতোষ সংগীতের ভূমিকা আমার মনে হয় অনেক বেশি। ছোট শিশুদের শুধুমাত্র লেখাপড়া তাদের স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। কিন্তু পড়াগুলো যদি ছড়ার মত সুর করে শেখানো যায় তাহলে তারা পড়ার প্রতি উৎসাহিত হবে। সপ্তাহে অন্তত দুইটা সংগীতের ক্লাস থাকলে একদিকে যেমন তাদের মন প্রফুল্ল থাকবে অন্যদিকে গানের প্রতিভা কার মধ্যে আছে শিক্ষক সেটা বুঝতে পারবেন।

৮. শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তরঃ সাধারণ শিক্ষার প্রতি সব বাবা-মাই যত্নবান থাকেন। সংগীত একটা প্রতিভা, সবার মধ্যে এটা থাকে না। স্কুলে যদি সংগীতের আলাদা ক্লাস থাকে তাহলে শিক্ষকরা সেই প্রতিভাকে খুঁজে বের করতে পারেন। তখন বাবা-মা ও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে দেখেন, বুঝতে পারেন। এভাবেই একজন ভালো শিল্পীর জন্ম হয়। শুধু এই লেখাপড়ার একঘেয়েমিপনা থেকে মনকে একটু প্রফুল্ল করতেও স্কুলে সংগীত শিক্ষার প্রয়োজন। তাছাড়া বছর শেষে আমাদের স্কুলগুলোতে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেটা সুন্দরভাবে সফল করার জন্যও শিক্ষাঙ্গনে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অনেক।

৯. সংগীত শিশুর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে কতটা ভূমিকা রাখে?

উত্তরঃ গবেষণায় দেখা গেছে, গান শোনার সময় মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্য যেকোন বিষয় যদি ছন্দ মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে শিশুরা সেটা দীর্ঘক্ষণ মনে রাখতে পারবে, স্মৃতিশক্তিও বাড়বে। দিনের কিছু সময় গান শুনলে মন ভালো থাকে। শিশুদের শুধু পড়ার প্রতি চাপ না দিয়ে খেলাধূলা বা অন্য যেকোন বিনোদনমূলক খেলা বা গানের দিকে আকৃষ্ট করলে তাদের মন, শরীর দুটোই প্রফুল্ল থাকবে। একঘেয়েমিপনা থেকে তারা মুক্তি পাবে। পড়াশোনার প্রতিও মনোযোগী হবে।

৪.৩ গবেষকের পর্যবেক্ষণমূলক মতামত

শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীত যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। বিভিন্ন শিশু মনস্তাত্ত্বিক তথা সাধারণ মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে শিশুদের দৈনন্দিন কর্মচঞ্চলতার মধ্যে সংগীতের চর্চাও একটি বিষয়। দেখা যাচ্ছে শিশু তার আপনমনে গুণগুণ করে কিছু গাইছে যেটা সে বিদ্যালয়ে শুনে এসেছে সেটাই সে হাসি খেলার ছলে অনবরত গেয়ে চলেছে। কখনো শব্দ ভুল হচ্ছে, কখনো সুর ভুল হচ্ছে। তারপর শিক্ষক বা অভিভাবকের সহযোগিতায় সে আবার শুধরে নিয়ে একা একাই গাইতে পারে। এর ফলে শিশুর সংগীত শিক্ষণের প্রতি যেমন একটি মানসিকতা তৈরি হচ্ছে পাশাপাশি মেধাও দৃঢ়শক্তিসম্পন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও যথেষ্ট সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছেন। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক উভয়ক্ষেত্রেই সংগীতকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতকে বিশেষভাবে মূল্যায়িত করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুরা নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভা তুলে ধরছে। তাছাড়াও অতিরিক্ত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী হিসেবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের নিযুক্ত করার মত মানসিকতা তৈরি করতে পারছে। সংগীত শিশুর মানসিকতাকে গোড়া থেকেই ব্যক্তিত্ববান করে তুলছে। দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিকতাবোধ, নৈতিকতাবোধে বলীয়ান করে তুলছে। মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক, অভিভাবক প্রমুখদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, সংগীত শুধুমাত্র শিশুকে নয় প্রভাবিত করে সমাজ তথা দেশকে। একটি জাতিকে স্বাধীনতা দানে সংগীত একটি বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে কণ্ঠযোদ্ধারাও এগিয়ে এসেছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। দেশের রক্ষায় সংগীতের এরূপ অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই মহান উদাহরণ শিশুদের মানসিকতাকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করে।

শিশুতোষ সংগীত শুধুমাত্র সাধারণ শিশুদের ক্ষেত্রেই নয় বিশেষ ধরণের বা প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এই ধরণের শিশুরা সাধারণত মনে ও ইন্দ্রিয়গতভাবে বেশ প্রখর হয়। তারা স্বাভাবিক জীবনে ততটা পারদর্শীতাপূর্ণ কাজ না পারলেও তাদের বোধগম্যতার যেকোন একদিক বেশ প্রখর হয়। যেমন কেউ গানে পারদর্শী হয়, কেউ নাচে, কেউ বা ছবি আঁকায়। অর্থাৎ এদের মেধা যেকোন একদিকে বেশ দীপ্তিমান হয়ে থাকে। এদের অনেককে যারা গান পছন্দ করে কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ বা বিপর্যস্ত তাদেরকে মিউজিক থেরাপি দেয়া হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে

এরা বেশ ভাল স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের এরূপ ব্যবহার শিক্ষকদের সহযোগিতা, সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। কেননা বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকই পারে একটি শিশুর আদর্শ হতে। অনুকরণপ্রিয় শিশুরা প্রতিনিয়ত শিক্ষককে অনুকরণ করে ভাল মন্দ সবকিছু আয়ত্ব করে। তাই ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সংগীত উপযোগী করে তোলাও শিক্ষকের একটি ইতিবাচক দিক হতে পারে। শিশুদের মানসিক বিকাশের ধাপগুলি যাতে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত হতে পারে তাই শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতের প্রচলন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংগীত একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অদম্য ভবিষ্যতকে আরো প্রজ্জলিত করছে। সভ্যতার শুরু থেকেই সংগীত মানুষের জীবনে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তগীতি, মঙ্গলকাব্য, কবিগান প্রভৃতি প্রাচীন সাংগীতিক নিদর্শনের মাধ্যমেই বোঝা যায় বাঙালি জাতি কতটা সুরের পিয়াসী। প্রাচীন সুর সমূহের এক অভূতপূর্ব ছন্দ মানুষের মনে এক গভীর ভাবাবেশ তৈরি করে। পাশাপাশি সংগীতের এসকল ধারার মাধ্যমে সংগীতের ভান্ডার আরও বেশি পরিপূর্ণ হয়। এরই চলমান ধারা এসে মিলিত হয় আধুনিক বাংলা গানের যুগে। সুর-ছন্দ, তাল-লয়, ভাবভঙ্গি সবকিছুতে চলে আসে আমুল পরিবর্তন। কথা ও সুরের আধুনিকায়নে গানের উপস্থাপনা আরো মাধুর্য্যমন্ডিত হয়ে ওঠে।
এই ধারারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে শিশুতোষ গান। শিশুদের নিয়ে বা শিশুদের মানসোপযোগী যে রচনা তারই সুরারোপিত সংযোজন হলো শিশুতোষ সংগীত। বলা যায়, জন্মের পর থেকেই শিশু সুরের সংস্পর্শে আসে। মূলত সংগীতের সাথে শিশুর মানসিক সম্পর্কের শুরু এখানেই। শিশুতোষ সংগীত একটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে বয়স অনুযায়ী সংগীতের তারতম্যও হয়। শিশুর আধো আধো বোলে কথা বলার সময় থেকেই এই সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গেও এই সংগীত জড়িত। বিভিন্ন ছড়াগানের সাথে মিল করে মানসিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিশুকে সংগীতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। এছাড়া ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিশুতোষ সংগীত ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শিশুতোষ সংগীতগুলোর বিষয়ের ফলেও শিশু সামাজিক, পারিবারিক, দেশপ্রেমিক, নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। কারণ শিশুদের এসব বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সংগীতে এই বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

শিশুতোষ সংগীত যে শুধুমাত্র শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য রচিত হয় এমন নয়। শিশুদের জীবনের কিছু শিক্ষামূলক অংশও এই সংগীত ধারায় পাওয়া যায়। শিশুতোষ সংগীত রচয়িতারা এরকম বিভিন্ন দিক ভেবে এই সংগীতের কথা ও সুর নির্মাণ করেছেন। শিশুর মানসিক উন্নয়নে যাতে এই সংগীত কার্যকর ভূমিকা রাখে তাই সহজ বোধগম্য সুরে, সহজ তালে এ সকল গান রচিত হয়। তাছাড়া শিশুরা যদি পারিবারিকভাবেও সংগীতের জন্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পায় তাহলে তাদের মধ্যে সামাজিক তথা পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে সাংগীতিক তথা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সুশিক্ষা ও সুন্দর পরিবেশ প্রসার করা সম্ভব। মানসিক উন্নয়নে বা বিকাশে শিশুতোষ সংগীত একটি বড় ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি সুকুমার শিল্প চর্চারও সুযোগ সৃষ্টি করে। সংগীত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে মানবিক সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয় । এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও অবগত হয়। শিশুতোষ সংগীত বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনেও ব্যাপক গুরুত্বের সাথে প্রচলিত হচ্ছে। কেননা প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের প্রারম্ভ পাঠের অংশ হিসেবে সংগীতের প্রচলন করলে শিশু মানবিক মূল্যবোধের অধিকারি হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন গবেষকরা শিশুদের এই সাংগীতিক সাহচর্যকে সুদূরপ্রসারি বলে মনে করেন। শিশুরা এই সংগীত চর্চায় ভবিষ্যতে সৃজনশীলতার মাধ্যমে সহজ-সরল সুর ও ছন্দের প্রয়োগে সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। দেশের ঐতিহ্য ধারণ, সমাজ ও পরিবেশ এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে জানে, গৌরববোধ করে ও দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়। শিক্ষাঙ্গনে সংগীতের সংস্পর্শে বা ব্যবহারে শিশুরা সংস্কৃতিমনস্ক হওয়া তথা সুনাগরিক হওয়ার পাশাপশি ভবিষ্যতে নিজেকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়। এই সকল দিক বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দীর যুগোপযোগী শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে তৈরি হতে পারে তাই বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম সেই ধারায়ই প্রস্তুত করা হয়েছে।

শিশুতোষ সংগীতের জ্ঞানে জ্ঞানার্জন করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন উৎস লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এসকল গান আজকাল বেশ সহজলভ্য। ইউটিউব, ফেসবুক, গুগল প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুরা তাদের ইচ্ছামতো গান খুঁজে বের করতে পারে। শিশুতোষ বিভিন্ন কবিতা, ছড়া বা গানকে ইংরেজিতে Rhymes বলা হয়ে থাকে। শিশুরা এসকল গান শুনে ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বাংলা ভাষাসহ ইংরেজি ভাষায়ও তাদের দখলদারিত্ব দেখা যায়। শিশুরা এসকল ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন রঙ, যানবাহন, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক এমনকি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়েজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে। শিশুতোষ সংগীতের মাধ্যমে শিশুরা যে শুধুমাত্র গানই শেখে এমনটা নয়। এর মাধ্যমে মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শারিরীক বিকাশও ঘটে। গানের সাথে শিশু হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে জানিয়ে দেয় তার শারিরীক সুস্থতার কথা। শিক্ষাঙ্গনে শিশুকে গানের সাথে তার মনের মত করে অঙ্গভঙ্গি করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আন্তর্জাতিক বিশ্বে শিশুদের সংগীতের প্রতি সম্পৃক্ততা থাকে তুলনামূলক আরেকটু বেশি। আমাদের দেশে যেমন সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বিশ্বে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শিশুদের অভিভাবকরা দুই বা আড়াই বছর বয়সেই শিশুকে সংগীতমুখী হতে উৎসাহিত করে। শিশুরাও

এসময় সুর, তাল, লয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে এদের ব্যবহার সম্পর্কে জানে। এরপর বড় হয়ে তারা যদি সংগীতের প্রতি আগ্রহী হয় তবে তাদের সে অঙ্গনে সাদরে গ্রহণ করা হয়। আর এভাবেই সংগীতের মাধ্যমে তাদের জীবন গড়ে ওঠে।

'শিক্ষাঙ্গনে শিশুতোষ সংগীতঃ ক্ষেত্র সমীক্ষণ' গবেষণাটির মাধ্যমে শিশুতোষ সংগীতের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষাধারার একটি বড় অংশ জুড়ে শিশুর মানসিক বিকাশে শিশুতোষ সংগীতের যে ভূমিকা রয়েছে তা শিক্ষাঙ্গনে, সংগীত-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের বন্ধনের মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের মানসিক বিকাশের অংশ হিসেবে সংগীতের এরূপ ধারা বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে শিশুরা তাদের মনোজাগতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বাক্ষর রাখবে তথা জীবনকে পরিশীলিত করে এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি ও চিত্রসূচি

সহায়ক গ্রন্থ

- করুণাময় গোস্বামী, *সংগীত কোষ*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
- শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত; প্রথম খন্ড*, আদিশক্তি প্রিন্টার্স,কলকাতা ৭০০০০৬, প্রকাশ ২০ জুলাই ১৯৭২
- পরিতোষ দাশ, *শিশুর মানসিক বিকাশে অভিভাবকের দায়িত্ব- কর্তব্য ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা*, প্রথম খন্ড, মূর্ধণ্য, ২০১৭
- আলী আসগর, *শিশু এক ভোরের সূর্য*, আনিন্দ্য প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
- পন্ডিত অহোবল, *সংগীত পারিজাত*, প্রকাশক- দীপায়ন, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ২০০১।
- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ২০০৫
- মারিয়া মন্তেসেরী, *দি অ্যাবজারবেন্ট মাইন্ড*, অনুবাদঃ অসিতবরন ঘোষ, নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
- যোগীন্দ্রনাথ সরকার, *খুকুমনির ছড়া*, বাংলাপ্রকাশ, ২০১৯
- শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বাংলার সংগীত (প্রচীন ও মধ্যযুগ);* কলকাতা; বাংলার সংগীতমেলা কমিটি; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬

সহায়ক দৈনিক পত্রিকা

- মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ, *শিশু কি পারবে?* কালের কণ্ঠ, নভেম্বর, ৩০, ২০১৮
- নিজস্ব প্রতিবেদক, *কোন গান বা সুর মাথায় গেঁথে যায় কেন?* বিবিসি নিউজ বাংলা, অক্টোবর, ২০, ২০১৮
- Anitanee, *Learning Music Educates Mind and Soul, but Often Falls to School Budget Cuts,* THE AGE, National, May, 24, 2015
- Amy Ellis Nutt, *Music lessons spur emotional and behavioral growth in children new study says,* The Washington post, January, 07, 2015
- Mohammad Al Mubarak, Music helps children expand their cultural horizon; The National; National association for music education, September 18, 2014

- Valerie Strauss, *Here's whats missing in music education: Cultural and social relevance*, The Washington Post, July, 19, 2019

প্রবন্ধ ও সাময়িকী

- Amy Spray, The science of music improves our memory and verbal intelligence, The Wshington post, July, 21, 2015
- Angela Jocelyn, *Music Educational School: Too Little and TOO late?* Evidence from Longitudinal Study on Music Training in preadolescents, December, 13, 2009
- Anitanee, *Music for Education & Welbeing Podcast: How Can Parents/ Carers Involve Children Preschool Music, with Liv McClennan*, Community Musician, Music Education Works, September, 15, 2019
- _____, *Rhythm based music programme helps pre-scchool children control their impulsive responses*, Music Education Works, October, 30, 2019
- _____, *Study shows strong links between music and academic achievement,* Music Education Works, Dewcember, 17, 2020
- April Kaiser(CDFC teacher), *The importance of music & movement*, Northern Illinois University, Child Development and Family Center, School of Family & Consumer Sciences
- Collen Ricci, *Lewarning Music Educates Mind and so falls to school Budget Cuts*, may, 04, 2015
- Diane cole, *The joy of learning to play an instrument later in life*, The Wall Street Journal, 23 April,2017
- Darby E. Southgate, *The impact of music on childhood and adolescent achievement,* SOCIAL SCIENCE, Quarterly, January, 15, 2009
- Guest Blogger, *Why is Music Education in School Important*, The Inspired Classroom
- Joanne lipman, *A musical fix for American schools*, The wall street journal, 10/10/2014
- Jenny Silverstone, *Turning In: Six benefits of music education for kids*, June,19,2018
- Jordan Smith, *Barriers Remain to Musioc Education for Children*, July 07, 2016

- Jessica Peresta, *How to integrate Music Into the Core Elementary Subjects*, November, 22, 2019
- Lydia, Stoddart & David Crosier, *Focus on: Do we need music in schools*, April, 05, 2018
- Marketing Team, *The Benefits of Studying With Music*, August, 13, 2019
- *Music Instruction improves cognitive, socio-emotional development in young children*, Medical News, Life Sciences and Medicine, June, 16, 2016
- Nina Kraus PHD & Samira Anderson AuD, PhD, *Music benefits across lifespan: Enhanced processing of speech in noise*, The Hearing Review, Sycle, July, 29, 2014
- Sharon Bryant, *Community Music Programmes Enhance Brain Function in At risk children*, September, 04, 3014
- Tara Garcia Mathewson, *NYC's only k-12 school with music as core subject sees high outcomes*, Education DIVE, 17/01/17,
- Tom Barnes, *Music Lessons were the best thing your parents ever did for you, According to science*, February,17,2015
- Ying Hu & Judit Szente, *Exploring the quality of early childhood in China: Implications for early childhood teacher education*, August 13, 2009

ওয়েবসাইট

- https://en.wikipedia.org/wiki/Niharranjan_Raychildrens music in education - Google Search
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8
- Chhayanaut - Banglapedia
- "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chhayanaut&oldid=966173542"
- Music education for young children - Wikipedia
- Music in World Cultures | PBS LearningMedia
- Music Together in School Settings | Music Together | Music Together
- The Impacts of the Western Music - Assignment Point
- Why Music Education Matters | Phoenix Symphony

- https://www.wsj.com/articles/the-joy-of-learning-to-play-an-instrument-later-in-life-149299944
- https://www.ncronline.org/authors/tara-garc-mathewson
- https://www.facebook.com/tattughola/posts/593343434035579/
- https://hifimov.cc/videos/6/Rs8uD6ygAcs/%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%96-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87/%E0%A6%95-%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Shishu_Academy
- http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Shishu_Academy
- https://en.wikipedia.org/wiki/Shilpakala_Academy
- http://en.banglapedia.org/index.php/Bangladesh_Shilpakala_Academy
- https://www.youtube.com/watch?v=Ka39I-A3Kbk

চিত্রসূচি

- https://www.google.com/search?q=charyapada&rlz=1C1CHBD_enBD799BD800&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Njsc3XzsWmENaM%252CPK2Jely1Rrqu2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT6LVY7jNO5kdNUCY4U7q2ffz-LHw&sa=X&ved=2ahUKEwiUivrn_7vwAhWFbisKHdFwDGkQ9QF6BAgdEAE#imgrc=Njsc3XzsWmENaM
- https://en.wikipedia.org/wiki/Gita_Govinda#/media/File:Odissi_poet_Gopalakrusna's_handwritten_Gitagobinda_Pothi.jpg
- https://roar.media/bangla/main/book-movie/sreekrishnakirtan
- picture of childrens music education in bangladesh - Google Search
- picture of childrens music education in bangladesh - Google Search
- picture of childrens music education in bangladeshi schools - Google Search
- picture of childrens music education - Google Search
- picture of childrens music education - Google Search
- https://www.momjunction.com/articles/music-games-activities-for-kids_00387016/
- https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fen.banglapedia.org%2Findex.php%3Ftitle%3DBangladesh_Shishu_Academy&psig=AOvVaw3ZwC1gj27Qy_-S1uXPsJ-

d&ust=1620497226700000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNih4d-UuPACFQAAAAAdAAAAABAD

- file:///C:/Users/HP/Desktop/Shilpakala-Academy-announces-Shilpakala-Award-2016-.html
- https://www.thedailystar.net/arts-entertainment/nazrul-institute-carrying-national-poets-legacy-forward-1275427
- https://eng.spdm.ru/bengal-foundation
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chhayanaut,_by_Murshed.jpg
- Bangladesh's Chhayanaut gets India's Tagore Award for Cultural Harmony 2015 | bdnews24.com
- https://www.ananda-alo.com/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE/
- https://www.shadow.com.bd/%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%93 /